নদীকূলে করি বাস

মাসুদ খান

একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড
ঢাকা

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০১
রচনাকাল ১৯৯৩—২০০০
©
ইরতিফা জান্নাত খান

একুশে পাবলিকেশন্স লিঃ
৪৩-৪৪ আজিজ কো-অপারেটিভ সুপার মার্কেট, শাহবাগ
ঢাকা ১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ইন্টারগ্রাফিক, ১১৩ ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০ কর্তৃক মুদ্রিত ও বাঁধাইকৃত

Nadikule Kari Bas (A collection of poems by Masud Khan)
Published by Ekushey Publications Ltd.
43-44 Aziz Co-operative Super Market, Shahbagh
Dhaka 1000, Bangladesh
Printed and bound at Intergraphic
113 Fakirapool, Dhaka 1000

মূল্য : ৮০ টাকা

পূর্ববর্তী গ্রন্থ পাখিতীর্থদিনে, ১৯৯৩, নদী, ঢাকা
ISBN : 984 759 006 0

মোসাম্মৎ আয়েশা সিদ্দিকা
সৈয়দা ইউনা সুলতানা
দুই প্রজন্মের দুই নারী, দুই মাতৃরূপ—

এবং এই কি সেই সূত্র ও সংহতি
যার প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময় ও অবস্থান থেকে
উঠে এসে উভয়ে দাঁড়িয়ে যান পাশাপাশি,
অভিন্ন সমতলে!

সূচি

বৃষ্টি-১ ৯
বৃষ্টি-২ ১০
বৃষ্টি-৩ ১২
বৃষ্টি-৪ ১৩
বহুদিন পর আবার প্রেমের কবিতা ১৪
নিদ্রা-১ ১৭
নিদ্রা-২ ১৮
আতাফল ২০
বাজার ২২
প্রজা, প্রজাপতি, চোর ও যম ২৪
চাঁদ ২৫
পথিপার্শ্বে এই এক বর্গবিঘৎ ক্ষেত্রের মধ্যে এই সময়ে কারা কী রকম আছে ২৬
মা ২৮
অজ্ঞাত উদ্দেশ ২৯
নদীকূলে চিত্রের মতো বসে থাকা কয়েকজন মানব-মানবী ৩০
কয়েকজন তরুণ কবি ৩২
একটি ভোরবেলা : সদ্য খসড়া-করা ৩৪
হাওয়া ৩৫
একটি ছুটির দুপুর ৩৬
ওসমান লঞ্চ ফেল করেছিল ৩৯
দুপুরের এক শূন্য বন্দর ৪০
আজ সমগ্র শহর ঘুরে ঘুরে দেখলাম ৪২
খাদ্যবিষয়ক একটি প্রতিবেদন ৪৪
২৬ বছর পর পিতামহের একটি অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল ৪৬
ধারাপাতগীতি ৪৮
পরিভ্রমণ, দূরের আকাশে ৫০
প্রতিবেশীদের কথা ৫১
যোগাযোগ ৫২
রূপকথা থেকে উৎকলিত ৫৪
পথ ৫৫
বীজ ও বপনকেলি-সংবাদ ৫৬
ইতিহাস ৫৮
প্রবণতা ৫৯
উপপাদ্য ৬০
কামার প্রসঙ্গে ৬২
সেই এক দেশ আছে ৬৪
সহবর্ণা, সহজা আমার ৬৫
ভিন্ন বাস্তবতার মধ্যে সহসাই ঢুকে পড়া কিছু লোক ৬৬
সভ্যতা ৬৮
প্রাচ্যতত্ত্ব ৬৯
লীলা ৭০
প্রাণী ৭১
প্রগতি ৭২
প্রগতি, পরিপ্রেক্ষিত নতুন শতক ৭৩
একজন বর্ণদাসী ও একজন বিপিনবিহারী সমাচার ৭৪
অভিব্যক্তি ৭৫
সখাসংগীত ৭৬

বৃষ্টি-১

এখন বিদেশে বৃষ্টি হচ্ছে, অতিদূর আর নিকট-বিদেশ।
ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগে থেকে থেকে অপর দেশের।
এ গ্রীষ্মসন্ধ্যায় আহা এমন বিষাদ আর রূপের অনুশীলন আজ
বিদেশী আকাশে!

কী যে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যায়
আর
পরধর্মে সাধ জাগে ধীরে ধীরে এমনই সন্ধ্যায়!

দূরে রূপশাসিত নদীর কিনারায়
বিদেশ অপূর্ব বৃষ্টিময়
মুহুর্মুহু বিজলিপ্রতিভায়।
আর
পররূপে কাতরতা জাগে মৃদু-মৃদু
এমনই সন্ধ্যায়!

তাজা হাওয়া বয়
খুঁজিয়া দেশের ভুঁই,
ও মোর বিদেশী জাদু
কোথায় রহিলি তুই॥

বৃষ্টি-২

বৃষ্টি হচ্ছে
বিদেশে
আরো কত কত আবছা ব্রহ্মদেশে, রঙ্গপুরে,
ব্যাপিত বগুড়াবর্ষে,
অনেক নিম্নের দেশে, ম্লেচ্ছাবর্তে,
বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে আসা
বিকালের ব্রহ্মদেশে,
বৃষ্টি হচ্ছে।

এবং উপর্যুপরি এই বিজলিশাসনের নিচে
এই বৃষ্টিনির্ধারিত তৃতীয় প্রহরে
দেশে দেশে কত রাঙা ও রঙিন জাতি
অস্পষ্ট গঠন নিয়ে ফুটে উঠছে উৎফুল্ল ভেকের মতো
অজানা উৎক্ষেপে।

বৃষ্টি আর বিদ্যুতের এই সহিংস প্ররোচনাক্রমে
চূড়ান্ত প্রশ্রয়ে
প্রলোভনে
বৃষ্টির প্রবল ঘোর আর
ঘূর্ণির ভেতর
বাতাসের অন্ধকারে
পূর্বাঞ্চলে
আকাশের নিচে
একাংশে, বিশাল ফাঁকা মাঠে
বিস্তারিত কচুখামারের আড়ালে আড়ালে
প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে জায়মান নতুন-নতুন সব রাষ্ট্র
ডানাভাঙা উত্থানরহিত কত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাষ্ট্র
তাদের ময়লা মানচিত্র
এবং অস্থির কাঁপা-কাঁপা ক্ষেত্রফল
অশোধিত আইন এবং সব অসহায় খর্বকায় ন্যায়পাল
এবং অপরিষ্কার কিছু কুচকাওয়াজসমেত জেগে উঠছে শুধুই
শুধু যমনির্দিষ্ট নিয়তি নিয়ে।

এইবার রাত্রি সমাপ্তির দিকে প্রবাহিত। এখন বৃষ্টিও নিভুনিভু-প্রায়।
ওইসব কথিত উল্লাসশীল জাতি আর বিকাশচঞ্চল রাষ্ট্র আর
তাদের শরীরে

গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে স্ফুটমান আর সদ্যফোটা কত-না বর্ণাঢ্য ধর্মরাজি
সবসহ অচিরে মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে
ভোরের আলোয়। বিস্তারিত কচুপ্রান্তরের আড়ালে আড়ালে।

বৃষ্টি-৩

রাত্রিতে তুমুল বৃষ্টি আজ
বিজলি আর ঝোড়োহাওয়াসহ।

আজ রাতে যেইখানে যত বাক্য আছ অর্থহীন হাবা-হাহাকার
যত বাক্য আছ ঠাণ্ডা আততায়ী উদ্বাস্তু ফেরার
যত বাক্য আছ ভাঙা-ভাঙা আর ভাঙাচোরা আর ফ্র্যাগমেন্ট
হঠাৎ ঝিলকে ওঠা দুনিয়ার যত লিপিহীন ভাষার কথারা,
স্ফুট ও অস্ফুট সব কথা—
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে অযথা-উৎপন্ন যত কথা, কথার শ্রাবণ—

আজ রাতে এত চেষ্টা করছি
ওইসব পালিয়ে-থাকা, অবিরাম পলায়নপর,
অসহায়, ঠাণ্ডা যত বাক্যে বাক্যে অর্থ আরোপের, উষ্ণতা আরোপের,
কথাগুলো সংগঠিত করবার—
কিন্তু নিষ্ফল!
কোনো বাক্য, কোনো বাণী বা বচন, ম্লেচ্ছ কিংবা মহাজনি, কিংবা নিরাকার
কিছুই আজ আর অর্থ পাচ্ছে না, আকার পাচ্ছে না।

বৃষ্টি-৪

আজ
এই বৃষ্টিবেহুলা রাত্রিতে
কত কত বাক্যোদয়
কত কত কথার স্ফুরণ...
যাঃ! দমকা হাওয়া এসে আচমকা সব
কথা, সব উদ্যম নিভিয়ে দিয়ে গেল!
এখন আর কিছুই করার নেই। কিচ্ছু করবার নেই—
চুপচাপ অনুভব করা ছাড়া।

সমস্ত ইন্দ্রিয় মেলে ধ'রে,
পাতাবাহারের সবগুলো পাতা ও পতঙ্গ
একসঙ্গে মেলে দিয়ে শুধু চুপচাপ অনুভব...
আর কোনো কথা নেই।

আর কোনও কথা নেই—
আশেপাশে এবং ভুবনে, কোথায়ও কেউ নেই,
বৃষ্টি ছাড়া অন্য কোলাহল নেই—
এখন সবাই মুছে গেছে ঝোড়ো বৃষ্টির তাড়নে।

কিছুকাল আগে, বহু বাহুল্যবাচনে আন্দোলিত ছিল রাতের আকাশ
অথচ এখন কোনো কথা নেই।
এইবার, জগতে জগতে, বিশ্বজুড়ে,
শুধুমাত্র ক্রিয়াপদে
শুধু ক্রিয়াকৌশলে নিষ্পন্ন হচ্ছে এক-একটি বাক্য।

বহুদিন পর আবার প্রেমের কবিতা

মেঘ থেকে মেঘে লাফ দেবার সময়
তূরীয় আহ্লাদে দ্রুত কেঁপে-বেঁকে
একটানে একাকার যখন বিজলিসূত্র, ওই ঊর্ধ্বতন
মেঘের আসনে এক ঝলক দেখা গেল তাকে
আলোকিত ঘনকের আকারে।

তাকে ডাক দেবো-দেবো, আহা কী বলে যে ডাক দেই!
জন্ম এক রুদ্ধভাষ জাতিতে আমার—
মুহূর্তে মিলিয়ে গেল অপর আকারে।

দূর মহাকাশে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফুটে আছে কত ফুয়েল-স্টেশন—
সেইসব এলোমেলো নৈশ নকশার মধ্যে তাকে, প্রিয় তোমাকেই,
ঘোর মধ্যরাতে
এইভাবে দেখে ফেলি আমিও প্রথম।
সর্ববায়ু আমার সুস্থির হয়ে যায়।

যেই দেখি আর ডাক দিতে যাই প্রিয়, অমনি
তোমার সমস্ত আলো, সকল উদ্ভাস
হঠাৎ নিভিয়ে নিয়ে চুপচাপ অন্ধকার হয়ে যাও।
আবার উদ্ভাস দাও ক্ষণকাল পরে—

এইরূপে খেলা করো, লুকোচুরি, আমার সহিত।
আমি থাকি সুদূর রূপতরঙ্গ গাঁয়, আর তোমার সহিত
তোমারই সাহিত্যে আহা এভাবে আমার বেলা বয়ে যায়।

এরপর থেকে একে একে এক উচ্চতর জীবের বিবেক
প্রথমে প্রয়োগ করে দেখি,
মিলিয়ে যাচ্ছেন তিনি আকারে ও নিরাকারে।
এক অতিকায় জট-পাকানো যন্ত্রের
আগ্রহ সাধন করে দেখি,
তা-ও তিনি ছড়িয়ে পড়েন সেই আকারে নিরাকার;
আকাশে আকাশে মেলে রাখা তার কী ব্যাপক কর্মাচার,
একটির পর একটি গ্রহ আর জ্বালানি-জংশন সব
অতর্কিতে নিভিয়ে নিভিয়ে প্রবাহিত হন তিনি।

একদা মণ্ডলাকার ছিলে জানি
আজ দেখি দৈবাৎ ধর্মান্তরিত, ঘনকের রূপে!
ঘনক তো গোলকেরই এক দুরারোগ্য সম্প্রসার।
তবুও তো ধর্ম রক্ষা পায়। রক্ষিত, সাধিত হয় তবু।

গোলকত্ব পরম আকার
গোলকতা যথা এক অপূর্ব বিহেভিয়ার, প্রায়-
নিরাকারসম এক নিখুঁত আকার।

শৈশবের কালে, এক আশ্চর্য মশলা-সুরভিত
গুহার গবাক্ষপথে আচম্বিতে ভেসে উঠেছিল মেঘ,
যার বাষ্পে বাষ্পে কূটাভাস।
কিছুতেই পড়তে পারি নাই সেই মেঘ
আমরা তখন।

বিব্রত বাতাস তাকে, মেঘে মেঘে সংগঠিত ক্ষণ-ক্ষণ-আকৃতিকে,
ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে যাচ্ছে কত বিভিন্ন প্রদেশে।
নিরাকৃত হতে হতে প্রায়, ওই তো ব্যক্ত হচ্ছেন ফের আকারে আকারে।
ধর্মচ্যুত হতে হতে প্রায়, ফের প্রচারিত হন ধর্মে ধর্মে।
আহা, ধর্ম হারালে কী আর থাকে তবে এ ভুবনে!
ঘনক যে গোলকেরই এক নিদারুণ তাপিত প্রসার।

বৃহৎ, অকল্পনীয় এক জড়সংকলন। বড় বালিপুস্তকের মতো—
তারই মধ্যে অকস্মাৎ একটু প্রাণের আভা। মাত্র তার একটি পৃষ্ঠায়।
এই সংকলনের ভূমিকাপত্রটিও নেই। ছিন্ন। সেই প্রধান সংঘর্ষে।

নিষ্ক্রান্তিদিবসে, অতঃপর, ওই গুহামুখে পড়ে থাকে
এ বিপুল জড়সংকলনের ছেঁড়া ভূমিকাপৃষ্ঠাটি,
অর্থাৎ সেই যে প্রথম ক্যাজুয়াল্টি, নিখিলের—
ওই গুহাপথে, নিষ্ক্রমণকালে।
একবার মাত্র দেখা হয়েছিল কায়ারূপে
ঝাপসা, ছায়া-ছায়া!
তা-ও বিজলির দিনে, তা-ও মেঘের ওপরে
উল্লম্ফকালীন।
এরপর থেকে শুধু ভাবমূর্তি...
যেদিকে তাকানো যায়
কেবলই, উপর্যুপরি ভাবমূর্তি ঝলকায়।

মাঠে মাঠে স্প্রিং স্ক্রু আর নাটবোল্ট ফলেছে এবার সব জং-ধরা।
সে-সব ভূমিতে হাঁটু গেড়ে গলবস্ত্র হয়ে পরিপূর্ণ দুই হাত তুলে
যাচঞামগ্ন সারি সারি সম্প্রদায়—তারা অসবর্ণ, তারা
লঘিষ্ঠ—কলহরত বিড়ালের আধো-আলো-আঁধারি বাচন ও কণ্ঠস্বর
কেড়ে নিয়ে দ্রুত নিজ কণ্ঠে কণ্ঠে গুঁজে দিয়ে সারিতে দাঁড়িয়ে যায় তারা।

তেজের অধিক তেজ
বাক্-এর অধিক বাক্স্ফূর্তি তুমি,
গোলকে স্ফুরিত হয়ে এসো পুনর্বার
পূর্বধর্ম ধারণ ক'রে সরাসরি উত্তম পুরুষে।

আর
কত অর্থ যে নিহিত করে রাখো বীজাকারে
সেইসব ভাসমান বাক্যের অন্তরে,
দৃশ্যত যা অর্থহীন অতি-অর্বাচীনদের কাছে।

সংকটে সংকটে, সর্ব-আকারবিনাশী
দহন দলন আর দমনের দিনে
আদিগন্ত কুয়াশা-মোড়ানো সেই তৎকালীন রৌদ্রের মধ্যেই
চতুর্দিক থেকে একসঙ্গে আর
বৃক্ষে বৃক্ষে আর দ্রব্যে দ্রব্যে আর ভূতে ভূতে সর্বভূতে
মুহুর্মুহু উদ্ভাস তোমার, এক অবধানপূর্ব রহিমের রূপে।
ঘনক তো গোলকেরই এক অপূর্ব অপিনিহিতি।

এইরূপে লীলা করো, লুকোচুরি, আমার সহিত।
আমি থাকি দূরের রূপতরঙ্গ গাঁয়, আর তোমার সহিত
তোমার সাহিত্যে দ্যাখো এভাবে আমার বেলা বয়ে যায়।

নিদ্রা-১

এমনও দক্ষিণাদিনে আজ
এই দেহ থেকে গোল-গোলাকৃতি চতুষ্কোণ
কত ধ্বনি বিকীর্ণ উপর্যুপরি—
প্রতিটি ধ্বনির সঙ্গে প্রবল মোচিত হচ্ছে প্রাণ
একটু একটু করে প্রতিবার, আর
এই রাংতারঙের রাত্রিতে যারা জীব,
তারা জানে, এই ধ্বনি কী জিনিস! কী যে অবস্তু-অতীত!
এই ধ্বনি মৃদু-মৃদু, বাগর্থেরও অধিক উত্তরে,
আজকের রাত্রিতে যেখানে যত অন্নময় ও ইলিশময় জৈবকোষ আছে
তাদের সবার সূক্ষ্ম তুঙ্গ হর্ষধ্বনিরও অতীত এই ধ্বনি।

আর
সব ধ্বনিই আসলে চূড়ান্ত। তুঙ্গ পুলকজনিত।

এই ধ্বনি মৃদু-মৃদু, বাগর্থেরও অধিক উত্তরে,
আজকের রাত্রির সমস্ত অন্নময় ও ইলিশময়
জীবানন্দ কোষের অতীত।

আজ রজনীতে যারা জীব আছ, অবশিষ্ট হয়ে আছ,
ঘুমিয়ে পড়ছ ঝুপঝুপ করে একে একে
একটি বাতাস ছাড়া অন্যসব বাতাসেরা রাংতা মুড়ি দিয়ে
বেরিয়ে পড়ছে ঝাঁকে, এই বদ্ধ জীব-সীমা পার হয়ে—
ছোট সৎবোনটিকে নির্জন বাড়িতে একা রেখে
যেমন বেড়াতে যায় বোনেরা, আহ্লাদসহ দূরে।
ছোট মেয়ে ভয়ে কাঁপে
ততোধিক কাঁপা-কাঁপা কুপির দীপন আগ্‌লে রেখে।

নিদ্রা-২

যারা কখনোই নিদ্রা যায় নাই
তারা জানে, এ এক অবাক অনুধাবন।

এই যে দাঁড়িয়ে আছি এখন, নিদ্রায় দ্রবীভূত
একটি পল্লির উপকণ্ঠে
কোনো শব্দ নেই, মাঝে-মধ্যে
দূর থেকে বাতাসে বাতাসে ভাসমান
উন্মুল আলোকলতা চিরে চিরে খুব মিহি হয়ে ভেসে আসছে
কিছু অতিনৈশ হাটুরেদের ছেঁড়া-ছেঁড়া হাঁকডাক।

অধিবাসীদের ঘন নিদ্রিত শরীর থেকে কত কত প্রাণ
বের হয়ে প্রবল জ্যোৎস্নার মধ্যে এখন বিচরমান এই আশেপাশে।
প্রাণদের কী যে হালকা-হালকা ঘ্রাণ!
কোথায় কোথায় তারা ঘোরে ছোট ভালুকের মতো
বাঁশঝাড়ে, ভাঙা ইমারতে, বালুচরে, কী যে করে!
হানা দিয়ে বসে জ্যোৎস্নায় মৌচাকে।

অর্থাৎ এখন এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ স্বপ্ন দেখছেন।
এ-সময় হঠাৎ কাউকে জাগানো কি সমীচীন হবে?
এতগুলো বিচরণমগ্ন প্রাণ একসঙ্গে এত দ্রুত
কী করে প্রবেশ করবে তবে শরীরে শরীরে!
যদি কোনো একটা প্রাণকে বহির্গত
রেখেই জেগে ওঠে কোনো ঘুমন্ত শরীর!
প্রাণপালিনীর খুব দুঃখ হবে তাতে।

তারপরও,
সে-এক অপূর্ব দেহত্যাগ, চিরচতুর্থ বায়ুর।

এক অপরূপ স্বপ্নভ্রমণের রাত্রি বয়ে যায়
মোহ জেগে ওঠে, মোহ ভেঙে যায়, নিশিডাকে, রাত্রিচারিতায়।

একটি হারিয়ে যাওয়া নভোযান

একখানি নভোযান—
খুব ভুলোমন আর উদাসীন গঠন-প্রকৃতি।

চেনা ও অচেনা যত পথ আকাশের, সব হারিয়ে হারিয়ে,
জরুরি দায়িত্ব দেওয়া ছিল কত, সব বেমালুম ভুলে গিয়ে
কোথায় সে-কোন্ দূর ভুবনে ভুবনে
একা একা বেড়ে ওঠে
ভেসে ভেসে ভারহীন
বহুদিন।
নিরুদ্দিষ্ট দিগ্‌ভ্রান্ত বালিকা...

এতদিন পর
আজ আর
ফিরবার
কোনো তাড়া নেই।

হয়তো ফিরবেও কোনো একদিন, বহুকাল পরে,
তথ্যহারা, আলাভোলা—
দাদখানি চাল মসুরের ডাল
চিনিপাতা কৈ...করতে করতে
বহু কিছু হারিয়ে হারিয়ে
ভ্রান্ত আর অতিরিক্ত হয়ে।

তার,
সে-নির্জন নভোযানটির,
হঠাৎ প্রত্যাবর্তনে
ভূবক্ষের বিজ্ঞানীরা অপ্রস্তুত হবেন কিছুটা—

হারানো কন্যাকে বহুদিন পর ফিরে পেলে অকস্মাৎ,
কিছুটা বড় ও বন্যরূপে, অভিভাবকেরা কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করে।

আতাফল

এই সেই ফল
সেই মিরাকল
রূপকের মতো ঝুলে আছে পৃথিবীর বহু ছায়াচ্ছন্ন দেশে দেশে।
দেখতে যেন-বা এক সবুজ গ্রেনেড
আবার কিছুটা বটে হৃৎপিণ্ডের মতো—
অভ্যন্তরে বারুদের তোলপাড়-করা ঘ্রাণ, আর
সুস্বাদ! অচিন্তনীয়।

শৈশবে যেখানে থাকতাম, নিকটেই ছিল এক পরিত্যক্ত ভিটাবাড়ি। প্রাচীন উদ্ভিদ আর লতাগুল্মে ভরা। একদিন গোধূলিবেলায়, পিতামহ, ঘুম থেকে সহসাই জেগে উঠে, অনেকটা রহস্যের নায়কের মতো গেলেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে সেই ভিটায়। হাওয়ায় আন্দোলিত পোড়ো ভিটা। বহু গাছগাছালির মধ্য থেকে গোপনে একটি গাছকে দেখালেন। সাধারণ একটি গাছ। কিছু ফল ঝুলে আছে তাতে। দেখতে অনেকটা গ্রেনেডের মতো। মেওয়াফল। আতা-মেওয়া। পিতামহ বললেন—এগুলা বেহেশতের ফল। একমাত্র স্বর্গজাত ফল, যার নমুনা দেখানো হয়েছে দুনিয়ায়। চুপচাপ দেখে নে। বলামাত্র আমার এবং পিতামহের সর্বাঙ্গ হাউই তুবড়ির মতো একসঙ্গে শিহরিত।

পিতামহের বিরল-বসন্ত-চিহ্নিত ফর্সা অবয়ব আর লম্বা-লম্বা গোধূলিরঙের দাড়ি, আমাকে, আমার শিহরনগুলোকে আচ্ছাদিত করে দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল একটানা প্রবল হাওয়ার ভেতর।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে পরিষ্কার হারাবতী নদীর ওপার।
অন্তরেখা বরাবর ওই যে উঠছে জেগে সুদূর কদলীবন। তারই ফাঁকে ফাঁকে
একা-একা রূপকথা হয়ে ওই ঘুরছে এক গেরিলা কিশোর—সহযোদ্ধারিক্ত,
পরিবার-পরিজন থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন,
পাক খেয়ে খেয়ে শুধু হারিয়ে হারিয়ে
একেবারে একা হয়ে যাওয়া এক গেরিলা কিশোর—
ডান হাতে আতাফল, বাঁ-হাতে গ্রেনেড,
বাম কানে ছোট্ট রিং, কাঁধে কালাশনিকভ, গায়ে ইস্পাতরঙের
জ্যাকেট, গলায় বুলেটের মালা, মাঝখানে হৃৎপিণ্ড—
সব আলপিনে আলপিনে গাঁথা।
অস্তমাখা দূরের কদলীবনে ভিনদেশী গেরিলা কিশোর।
কথা বলে ঝটপট, অবিকল সন্ত্রাসের বাগ্‌বিধিতে।
অন্য কোনো ভাষা নেই, কোনো বিধি নেই বনভূমে ওই বাগ্‌বিধি ছাড়া—
আর সন্ত্রাসের বিপরীতে মুহুর্মুহু অপরূপ সন্ত্রাস...
প্রতিটি সন্ত্রাস প্রণয়নশেষে, বারবার, আঁজলা ভরে জল খায়
আর পাক খেয়ে খেয়ে হারিয়ে হারিয়ে
একদম একা হয়ে যায় এই গেরিলা কিশোর,
সন্ত্রাসশিল্পের রচয়িতা।

আর এই সেই ফল
সেই মিরাকল
রূপকের মতো ঝুলে আছে পৃথিবীর বহু ছায়াচ্ছন্ন দেশে দেশে
অস্তমাখা কাতর গ্রেনেডফল। অভ্যন্তরে বারুদের মৌ-মৌ ঘ্রাণ, আর
সুস্বাদ! অচিন্তনীয়।

পক্ষান্তরে, গ্রেনেড—অপূর্ব এক ইহফল।
গ্রেনেড—কিছুটা উগ্র কিন্তু চমৎকার এক ইহফল।
রূপকের মতো ঝুলে আছে পৃথিবীর বহু রৌদ্রোজ্জ্বল দেশে দেশে।
অভ্যন্তরে কোনো এক দুর্লভ ফলের মাতাল-করা ঘ্রাণ।

বিদেশী অরণ্য আজ আতায় গ্রেনেডে তোলপাড় এই গোধূলিবেলায়।

ভিনদেশী গেরিলা কিশোর
তার ডান হাতে আতাফল, বাঁ-হাতে গ্রেনেড এবং
মাঝখানে হৃৎপিণ্ড—এভাবে ভারসাম্য রেখে রেখে
টালমাটাল পায়ে স্বর্গসড়কের সেই মহাবিপদ্‌জনক সাঁকো
পার হয়ে সর্বাগ্রে, দুর্লভতর এক ইহফলের স্মারকবার্তা নিয়ে
স্বর্গদ্বারে করাঘাত...
অনেক পেছনে পড়ে থাকে পুণ্য যাত্রীদল।
তারা আতঙ্কজনকভাবে পেছনে।

আর এই সেই ফল
সেই মিরাকল
রূপকের মতো ঝুলে আছে পৃথিবীর বহু রৌদ্রচ্ছায়াময় দেশে দেশে।

বাজার

১.

ধ্বনিত এতসব পণ্যসংগীত
শ্রব্য কিছু, তবে শ্রবণাতীত বহু গীত।
টাকারা ফুর্তিতে মুহুর্মুহূর্তে
নাচছে সমতালে হারিয়ে যথাসম্বিৎ।

মুদ্রাদূষণের দিনে ও রাত্রিতে
ভুতুড়ে পুঁজিদের পুঞ্জীভবনের কালে
পণ্য বিবেচিত সকলই; বিধৃত
নকশাচিত্রিত জাফরি-কাটা শত জালে।

জ্যোৎস্নালোকে, ধু-ধু মাঠে, একেবারে খোলা আকাশের নিচে
স্থাপিত নতুন টাঁকশালযন্ত্র—
তার গায়ে কনুই ঠেকিয়ে
বাহুতে ত্রিভুজ তৈরি ক'রে
সটান দাঁড়িয়ে আছে এক নাঙ্গা টাকাকর্মী।
ঝরছে শিশিরের কুচি অবিরল জ্যোৎস্নাগন্ধমাখা
ঝকঝকে যন্ত্র আর মানবের গায়ে।
এবং আকাশে ভাসমান নৈশ মেঘ
সাদা-সাদা পাপের প্রতীকে।

এখন টঙ্কনক্রিয়া শেষ। আপাতত, আজকের মতো।
যন্ত্র থেকে ছিটকে ওঠা বিচিত্র রঙের সব যন্ত্রণার অবশেষ,
টুকরো টুকরো, ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো।

যন্ত্রণার উৎস তবে ওই যন্ত্র, যন্ত্রশ্রেষ্ঠ?

২.

বাজারের বিরুদ্ধে ভোরে, অভ্যন্তরে, জাগছে বাজার।

বাজারে বাজারে অবাধ প্রচারে
অ্যামপ্লিফায়ারে বাড়ানো আওয়াজে
সাংকেতিকের কুয়াশা-ছড়ানো কত যে ভাষায়
সংবাদ আসে গুপ্ত পণ্যের,
অনুবাদ হয় গোপন মুনাফা
আর
উপর্যুপরি উর্ণা খুলছে, ডিকোড হচ্ছে
প্যাকেজ-মোড়ানো এত যে রঙিন বার্তা!

সিল্ক আর রশ্মিতে প্রস্তুত
দিস্তা-দিস্তা কোমল ফ্যাব্রিক
তাই দিয়ে তৈরি
মসৃণ মখমলে সব তহবিল।

তহবিল উপচে উপচে পড়ছে রুপা ও রেশম
আর মুদ্রা, শুধু মুদ্রা, নিদ্রাহীন, অফুরন্ত, অবিরল।
রাত্রিরঙা আর জ্যোৎস্নারঙা আর
কুয়াশারঙের আর আগুনরঙের আর বানররঙের শতসহস্র মুদ্রায়
বাজার সয়লাব।

পাসওয়ার্ডের হিমশুব্ধ সন্ধ্যাভাষার জালে
এবং সিল্কি রুমালে রুমালে
জড়িয়ে রাখা, নিরাপদ ঘুম পাড়িয়ে রাখা
সার-সার সব রেশমি অ্যাকাউন্ট।

দেশে দেশে, খুব ভোরে
ঝলমলে পণ্যের বিপরীতে
কলরব করে জেগে উঠছে
ওইসব ঘুমন্ত রেশমিত হিসাব-নম্বর।

বাজারের বিরুদ্ধে ভোরে, অভ্যন্তরে, জাগছে বাজার
পণ্যের বিরুদ্ধে ভোরে, অভ্যন্তরে, পণ্য আবার।

এবং এদিকে খুব উত্তেজিত রাত্রিরঙা টাকাগুলি সারা রাত
তাড়া করে ফিরছে যত গোধূলিরঙের টাকাদের
পূর্ব থেকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে ক্রমশ পশ্চিমে...

প্রজা, প্রজাপতি, চোর ও যম

ঘুচিয়ে দিয়েছে যত তাসের তাসত্ব
তাসের রাজার রাজ্যস্বত্ব আর তাসস্বত্ব, সব
এইমাত্র এলোমেলো একাকার। আর, দ্রুত যার যার নতুন বিন্যাসে
ছড়িয়ে পড়ছে পুনর্বার।
তা সত্ত্বেও আঁধারে দাঁড়ানো চোর, নিম-চন্দ্রালোকে নৈশ আত্মীয়—
যেন চিরস্থানু, যেন শ্যাওলা-পড়া ভুতুড়ে ভাস্কর্য—
তবু ওই স্নিগ্ধ চোর, তবু তার বৃত্তি, প্রাচীন প্রবৃত্তি
ওহো তার প্রবৃত্তির সৌগন্ধে গন্ধব্যঞ্জনায় মুগ্ধ হয়ে আছে সমস্ত অতীত
এবং অধুনা—
সকল ছাপিয়ে উঠে শেষে শীর্ষে জেগে থাকে তস্করের নিপুণ তাস্কর্য।

আঁধারে দাঁড়ানো চোর, চোর নয়, যম,
চোর বলে ভ্রম হয় শুধু চিরদিন...
আর যম চিরকালই করে থাকে প্রজাসংযম
ক্ষান্তিহীন, নিয়তিবাধিত।

কাগুজে তাসের গায়ে আঁকা বহুবর্ণ রাজা—
রাজ্য আর রাজত্বের পরমার্থ তিনি, প্রজাপতি,
প্রজাদের পতি, ফুরফুরে, রূপকে ও রহস্যে রঙিন।

চিত্রার্পিত তিনি, মহাস্থবির, অথচ
বিচিত্র প্রতাপ তার এই তংসরাজ্যের সীমানা ছাড়িয়েও
কত দেশ-দেশান্তরে সাগরে ভূধরে
পাহাড়ে জঙ্গলে আর কালের উদরে
তীব্র বিচ্ছুরণ—

কীভাবে সম্ভবে!
হতবাক হয়ে ভাবে সাধারণ প্রজাসাধারণ।

চাঁদ

চাঁদ, অর্থাৎ ওই পিতৃস্থল থেকে প্রতিহত হয়ে
এক ক্ষিপ্র বারুদবিন্দুর যথা-উচিত গতিতে
বারংবার সেই একই পিত্রায়ণপথে ভূপতিত হই
ভূপৃষ্ঠের বহু বাগানের সবজি বিভাগে বিভাগে,
রাশি-রাশি বাষ্প আর মহাকাশে
ভাসমান কত কোলাহল সহযোগে।

এমনিতে, ত্যাজ্য সন্তানের বোধে, পিতৃগৃহই কী দুরারোহ!
তা-ও ভেদ করে আরো ঊর্ধ্বে, আরো শূন্যে, কথিত সপ্তম স্তরে
আরোহণ কিছুতেই হয় না আমার—
আরোহ আরোহ ব'লে যদিও ব্যাকুল এক প্রণোদনা
সংরক্ষণে থেকে যায়।

উদ্ভ্রান্তের মতো একে একে
প্রথমে মানবজন্ম, দ্বিতীয়ে জিরাফ,
তারও পরে অস্থির ফড়িং আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুরভিত মেশিন-জনম
পার হয়ে হয়ে...
অনেক অস্পষ্ট ধর্মে ধর্মে বয়ে গেছি মৃদু ঢেউ তুলে
ছল্‌কে ছল্‌কে জাতি থেকে জাতি।

অবশেষে, নির্ভাবন এই মগ্ন সারসজন্মেই
সুস্থির হয়েছি এক খ্যাতিরিক্তা বালিবক্ষা ডাহুক নদীর ধারে
যার তীর থেকে তীরে একটিই সুদীর্ঘ সহজ বনস্পতি,
উপবাসকৃশ, খুব কাহিল, অথচ দৃঢ়, ঠা-ঠা বজ্রপাতের বিরুদ্ধে
যথাযথ আর্থিং ও নিরোধকসহ সরল দণ্ডিত
একা, এক, দ্বিতীয়রহিত।

পথিপার্শ্বে এই এক বর্গবিঘৎ ক্ষেত্রের মধ্যে এই সময়ে কারা কীরকম আছে

সিগারেটের রাংতা এক টুকরো : *সর্ষে মসুর যব গোধূমের ক্ষেত*
সারি সারি মোজাইক-ঝিলিকের আকারে
সাজানো বর্গাকার। তারই মাঝখানে হঠাৎ
রসুনক্ষেতের মতো সম্ভ্রান্ত এক বিদেশী বিহ্বল
নভোচারিণীর আবির্ভাব—অ্যালুমিনিয়ামরঙের শরীর,
ট্রাউজারের পকেটে হাত, দুই পা দু-দিকে ছড়িয়ে
দাঁড়ানো।

একটি একা কালো ডেয়োপিঁপড়ে : *ইনিই কয়লাচোর। সারাদিন রৌদ্রে রৌদ্রে*
গাধায় চড়ানো উল্টামুখীন, সারা শহরের
বিদ্রূপ-কল্লোলিত রাস্তায় রাস্তায়।
এখন আগুনবন্ধ পানিবন্ধ চিনিবন্ধ পিপীলিকা। একা
একঘরে করে রাখা—স্মারকসংখ্যাহারা।

একটি ঝরা বাঁশপাতা : *দক্ষিণ-শহরের উপজাতি।*
ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে
কেবলই দখিনা হাওয়ার সাথে মৈত্রী।
পথের ধারে তোমার বাসা, দখিন হাওয়া,
শুনি তোমার আসা-যাওয়া
শুনি তোমার পায়ের ভাষা, দখিন হাওয়া...
ঝিরঝির সুরে এই গান গেয়ে গেয়ে গেয়ে
এখন ঝরা; ফুরফুরে সোনালি কার্বন।
সোনালি কার্বনকপিতে স্তরে স্তরে
বিছানো সোনালি বর্ণ-বাক্য মহাপ্রাণ।

কয়েকটি ভাসমান শিমূলতুলা : *ভ্রমণপরায়ণ ওই বৈকালিক রাজমহিলারা,*
দাসীসহ, ধুলায় ছেচড়ে চলে
বিচ্ছুরিত রুপালি গাউন।

অনেকগুলো কালো ও তামাটে পিঁপড়ে : *আজ উল্লাস দিবস।*
আজ বয়ে যায় নিম্নবর্গ প্রজাদের স্রোত,
ওই যে হাসিখুশি আলতাবিলাসী ডোমনি,
ইনি তার ডোম, চোলাইবিহ্বল।
বেতনহাতে প্রবাহিত ওই যে বাঁকাহাসি
মুর্দাফরাশ। ওই যে তাম্বুলরাঙা ঝাড়ুদার,
আর উনি কোতোয়াল, কব্জিতে অষ্টধাতুর ব্যান্ড,
ওই যে স্থূলাঙ্গ এক তরুণ খোজা
—আজ উল্লসিত সব। সব বৃষ্টিবিলাস
হাবসি কাফ্রি কাবলিওয়ালা।
আজ ফাইলবিহীন বেতন-বোনাসের দিন।
আজ রাজন্যরা সব অধস্তন।
অমাত্যরা একটানা করণিক।

নাদুসনুদুস ক্রীতদাস আর কিশোরীমোহন দাশ একযোগে
ঘুমায় আজ পৌর জলাধারের ছায়ায়। নগরপিতার গুরুগুরু
নাসিকা-নির্ঘোষে হায়
বারবার ঘুম ভেঙে যায়।
ভিস্তিঅলা নিরুপায় ভিজে যায় জলে।

উনি এক রূপোপজীবিনী, সর্দি-লাগা কনিষ্ঠের হাত ধরে
বেড়াতে এসেছেন অন্য নতুন শহরে। আর ওই যে উনি
সিসাবণিক, ইনি গন্ধবিক্রেতা, উনি হিসাবরক্ষক,
ইনি কোষাধ্যক্ষ
এবং পাশেই গুঁড়িগুঁড়ি ইলশেগুঁড়ির দিনে
ইলিশচোরের মাধ্যমিক ভাই। ওই যে কাত হয়ে, কাল্পনিক
হয়ে, উৎকলিত হয়ে বসে আছেন, উনি কবি, কবিরাজ।

আজ সবাই বাইরে বহির্ভূত বহমান ইনট্রানজিটিভ।
নব্য রেশমজড়িত।

মা

এই ধূলি-ওড়া অপরাহ্নে,
দূরে, দিগন্তের একেবারে কাছাকাছি
ওই যে খোলা আকাশের নিচে একা শয্যা পেতে শুয়ে আছেন,
তিনি আমার মা।
দূর্বা আর ডেটলের মিশ্র ঢেউয়ে ঘ্রাণে রচিত সে-শয্যা।
নাকে নল, অক্সিজেন, বাহুতে স্যালাইন, ক্যাথেটার—
এভাবে প্লাস্টিক-পলিথিনের লতায় গুল্মে আস্তে-আস্তে
জড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি।

শয্যা ঘিরে অনেকদূর পর্যন্ত ধোঁয়া-ধোঁয়া
মিথ্যা-মিথ্যা আবহাওয়া।

মনে হলো, বহুকাল পরে যেন গোধূলি নামছে
এইবার কিছু পাখি ও পতঙ্গ
তাদের উচ্ছল প্রগল্‌ভতা
অর্বাচীন সুরবোধ আর
অস্পষ্ট বিলাপরীতি নিয়ে
ভয়ে ভয়ে খুঁজছে আশ্রয় ওই প্লাস্টিকের ঝোপঝাড়ে,
দিগন্তের ধার ঘেঁষে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা প্রাচীন মাতৃছায়ায়।

অজ্ঞাত উদ্দেশ

অজ্ঞাত উদ্দেশে বয়ে চলা, বইয়ে নিয়ে চলা, এক দীর্ঘ সারি, শিশুদের—
সেই দ্রুত শিশুপ্রবাহের মধ্যে
বহু কষ্টে খুঁজে পেয়ে নিজের শিশুকে চুমু দিতে গিয়ে
আচমকা পাশের অচেনা বালকের গালে চুমু লেগে যায়।

তারপর আর ফিরে না পাওয়া, আর হারিয়ে ফেলা চিরতরে।
বিহ্বল স্তম্ভিত হয়ে থাকা পরবর্তী সারাটা জীবন...

নদীকূলে চিত্রের মতো বসে থাকা কয়েকজন মানব-মানবী

একজন.

কাঁখের কলসি তার গেছে ভেসে কবে
ঢেউ লেগে উজান-নৌকার।

বায়ুতে, ঘূর্ণিতে, জল-কলামের শীর্ষে শীর্ষে ভেসে ভেসে
সেই পাত্র, পানিপূর্ণ, গিয়ে মেশে যদি চিরকালে—
এই আশায় আশায়
যার সে-কলসি
সে এখন নদীকূলে একা ও অপেক্ষাকৃত হয়ে বসে থাকে
মৃদুমন্দ হাওয়ার ভেতর।

অন্যজন.

একবার মাতৃগর্ভে, আরো একবার
আঁচলে-অঞ্চলে বয়ঃসন্ধিকালে,
জমজ যে-সহোদরা, তাকে
উত্যক্ত করার অব্যবহিত পরেই
অঙ্কুরিত হয়েছিল কিছু
অবাক অনুশোচনা—
সেগুলি বহন করে নিয়ে
অনেক রোদের মধ্য দিয়ে হেঁটে হেঁটে
গিয়ে বসে থাকে নদীকূলে।

জাহাজ চলেছে নদী দিয়ে
ভূতগৃহীতের মতো, অজানা অকূলে।

আরো একজন.

পুত্রকে হারিয়ে ফেলে দূরে, পশ্চিমের কোনো অচেনা মেলায়,
বহুদিন ধরে খুঁজে ফেরে শুধু নদীকূলে আর হাহাকার...

আরো কয়েকজন.

নানা জাতি থেকে নানাভাবে নিরুদ্দেশ হওয়া কিছু মানব-মানবী
একেবারে নদীর কিনারে এসে খুব ঝুঁকে বসে থাকে।
কিছু দূরে দূরে। চুপচাপ একা-একা । কেউ কেউ পা ঝুলিয়ে।
তাদের বিশুষ্ক হাসি, শুধু
মিলিয়ে মিলিয়ে যায় বিকালের নদীর আভায়।

বহু অনুষঙ্গ থেকে, বহু আরোহণ আর উড্ডয়ন থেকে
একে একে নিজেদের পরিপূর্ণ প্রত্যাহার করে নিয়ে
অনেক সাধনা দিয়ে স্থাপিত হয়েছে তারা নদীকূলে।

নদীকূলের পরিবেশ বর্ণন.

নদীকূলে অর্ধ-উপবৃত্তাকারে বসে থাকা কয়েকটি মানব-মানবী
দাঁড়িয়ে রয়েছে বৃক্ষ, ঘন-ঘন উদ্ধারচিহ্নের মতো
তাদের পেছনে—
এইসব সমন্বিত দৃশ্যের ওপর দিয়ে ভেসে যায় মেঘ,
ধীর সাদা মেঘ।
যেন এ-নদীপৃষ্ঠার ঠিক মুড়িপত্র হতে শুরু ক'রে, ডাঙায়,
দিগন্ত অবধি অববাহিকায়,
আয়াতে আয়াতে বিন্যাসিত সারি-সারি হরফের ওপরের খোলা আকাশ দিয়ে
মন্থর উৎসবরূপে বয়ে যাচ্ছে কত-না হরকত,
ধীর হরকতের সিরিজ...

হরফগুচ্ছের থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন নিঃশ্বাস
ঝালর দুলিয়ে দিচ্ছে মৃদু-মৃদু, হরকতগুলির।

কয়েকজন তরুণ কবি

(উদ্‌জান, অম্লজান, সালফার, প্লাটিনাম, টাংস্টেন, কার্বনা প্রমুখ)

কোথাও বিবাহ নেই আজ।
সব যুক্তি নিভিয়ে আকাশ পরিষ্কার।
অথচ, ছিটানো শুক্রাণুর রূপে কিলবিল-করা
কিছু যুক্তি এখনো অবশিষ্ট, চরাচরে।

আকাশের দেহ থেকে কত-কত স্নেহ, বিচলিত,
ঝুরঝুর ঝরে পড়ে ধীর ধীরাশ্রয়
তবু শুকনা নদীর তীরে,
তবু সোনালি খড়ের ধারে,
ছড়িয়ে ছড়িয়ে থাকা লোহিত লঙ্কার ক্ষেতে ক্ষেতে।
এমনই আদর্শ দিনে, এরকম স্নেহের দুপুরে,
যুক্তি ও জীবাণুহত্যা মহাপাপ, তা-ও জেনে
কোথা হতে ছুটে আসে একঝাঁক তুরস্ক-তরুণ।
তোলপাড়-করা কত যুক্তির শৃঙ্খলা ভেঙে মুহূর্তে মিসমার করে দিয়ে...
কী যে পাপকৃত্য হলো শুক্রবারে, শুক্রবাসরীয় দিনে—
ধর্মাধর্ম যা সারার, ক্ষিপ্র সেরে নিয়ে,
ওই যে
ঝিমাচ্ছে এখন রৌদ্রচ্ছট মহামহিমেরা, কড়া রোদে, জলাশয়ে,
শ্যাওলা-ইমালশনে, ছাতিমের তলে,
স্নিগ্ধ গরুচোরের মতন দ্যাখো এখন আর কিচ্ছুটি বলছে না,
সম্ভবত ব্রীড়া আর বিভ্রমবশত।

ধীরে ধীরে ওই শ্যাওলায়,
ছাতিমের ছাতায় ছাতায় ঝুপঝুপ করে
দিনদুপুরেই এসে ভর করবে বহু সন্ধ্যা, আর্যপূর্ব আমলের।

তাই তো বলি,
যখন ঘুমিয়ে থাকি আমরা দুপুরে—
ওই নদী,
দূরবর্তী শিয়ালের ভাঙা-ভাঙা অর্ধ-অবাস্তব ডাক, আর অব্যবহিত
বামন মানুষদের কত কীর্তি আর বিষ্ঠা,
সব এরকম একাকার আর অযৌক্তিক করে রাখে কারা, প্রতিদিন!

ছকের নানান ঘরে
পরস্পর অবস্থান বিভিন্ন বদল করে করে
রকমারি চরিত্রের মতো কেঁপে কেঁপে ছয় দিক থেকে
ওই যে উপর্যুপরি ফ্ল্যাশ মারতে মারতে
আবার আসছে হেঁকে ষড়ভূত, ষড়-এলিমেন্ট—
চলো তো আড়াল হই, দেখি—
সেই যে শুকনা নদী, পুনরায় শিয়ালের ভাঙা-ভাঙা ডাক,
বামন মানুষদের কত কীর্তি আর বিষ্ঠা, এঃ হেঃ, সব কীরকম
একাকার আর যুক্তির অতীত করে ফেলছে রে...

একটি ভোরবেলা : সদ্য খসড়া-করা

ভোরের বাতাস আজ উন্নত দেশের
কাগজি টাকার মতো সপ্রতিভ—
একটানা সতেজ কখনো, কখনো-বা থেমে থেমে।

আর এই প্রভাতবেলায়
লালায়
রেশমসূত্রের গ্রন্থনায়
গাছে গাছে এখন গ্রন্থিত হয়ে আছে
প্রবন্ধের পাতার আকারে বহু উড়ন্ত জটিল পাতা
স্থগিত হয়ে থাকা কাণ্ডে, কাণ্ডজ্ঞানে,
অবাক বিন্যাসে যথা নদীর ওপারে।

কিছুক্ষণ আগেই এই তো
বেশ কিছু স্ফূর্তিশীল পাখি ও পতঙ্গ
তোলপাড় করছিল পৃথিবীর গাছে গাছে।
আকাশ তাদের জব্দ করে নিয়ে চলে গেছে অনেক উঁচুতে
মাখন-রাঙানো মেঘরাজ্যে
ওই ঝুরঝুর ঝরে পড়া চিকচিকে সোনালি চিনির দেশে—
মেঘে মেঘে প্রচারিত আজ তাই অনেক অচেনা কোলাহল।

অগ্রহায়ণের এই ভোরবেলা
দৃশ্য আর ঘটনার এই যে অসহ্য অতর্কিত রূপ
এসবের অন্তরালে, নিসর্গের কোন্ অভিপ্রায়,
সে-কোন্ প্রবাহে, ছকে, সে-কেমন ভাষ্যে, ব্যঞ্জনায়
কীভাবে যে মীমাংসিত হয়ে আছে!
ভোগী মানুষের অনুগত প্রাণ আর
ব্যসনব্যঞ্জন উপলব্ধি দিয়ে যতদূর বোঝা যায়, বুঝি,
বুঝতে প্রয়াস পাই,
যতভাবে অনুভব করা যায়, করি।

আজ অগ্রহায়ণের এই তাক-লাগানো প্রভাতবেলা—
একা আমি বসে বসে ওইসব পাখিহারা স্তব্ধ গাছে গাছে
একটু একটু করে পাখি আর মৌমাছি মেশাই,
একটির পর একটি মৌচাক বসিয়ে যাই ডাল থেকে ডালে—
কিছুটা বিশেষ্য করে তুলি।

হাওয়া

সারাদিন বিভিন্ন হাওয়া বয়। হাওয়া!
অনেক দূরের দেহে, দূর মেরুরেখায় শোষিত হয়ে হয়ে
আজ পুনর্মুক্ত হচ্ছে এখানে, এখন
এই মধ্যপ্রকাশ অঞ্চলে।

গোলকের ওইপার থেকে আসে হাওয়া—
প্রতিটি বিভাগ আর দিবস-রাত্রির দেহে দেহে
স্থির হয়ে আছে।

একদিন সম্ভবত অস্থির অচেনা এক বায়ুপ্রবাহের
মধ্যেই মুদ্রিত হয়ে র'বো।

তার বেশ আগে
আমাদের অসম্পূর্ণ রেখে,
আমাদেরকে অশেষ করে দিয়ে বায়ু বয়ে যায়।
নদীকূলে বংশপরম্পরাক্রমে, আমার, পুত্রের, তার পুত্রের, এবং দৌহিত্রের
বহু চুল এলোমেলো করে দিয়ে,
রকমারি রৌদ্র আর মরুবালুকার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া গৌণ সংবাদের মতো
বায়ু বয়ে যায়।
মৃদু-মৃদু, গম্ভীর, বিশিষ্ট ভাবমূর্তি সহকারে।

একটি ছুটির দুপুর

মহাকাশে
যেইখানে যেটুকু আশ্রয় আছে
নভোজাহাজেরা সব নোঙর করেছে
স্টেশনে জংশনে স্পেস-পোতাশ্রয়ে—
আকাশের যাত্রীছাউনিগুলি আজ সব ফাঁকা-ফাঁকা।

দিন আজ দূরে দূরে
দিন আজ ফুরফুরে ফড়িঙের রূপে...
দিন কী যে ছুটি-ছুটি লাগে
কী যে শান্তি-শান্তি জাগে ভাব আজ আকাশে আকাশে!

এইরূপ ইষ্টদিনে
মহাকাশ থেকে আজ অনর্গল মিষ্ট কথা...

ইষ্টদিনে মিষ্ট কথা আসছে ভেসে ওই
বেতার ঢেউয়ে ঢেউয়ে
তবু একটি মহাবিষাদ কই
কানকো দিয়ে উঠছে বেয়ে ধীরে
আকাশভরা বিকিরণের মেঘরেশমি চিরে।

একটি ফড়িং গতির স্ফূর্তিতে
মহাবিশ্বে দিচ্ছে পাখা মেলে
হরেক রকম রশ্মিজালের তন্তু ঠেলে ঠেলে।

যেন
নিদ্রামধ্যে অনুষ্ঠিত ভিন্ন জাগরণ
বেগের দিনে আজকে হঠাৎ অবাক মন্থরণ!

এদিকে দুপুরে
নিখিলের বরাদ্দকৃত বহুপ্রতীক্ষিত এই ছুটির দুপুরে
দুই দূরবর্তী ভুবনের দুটি চমৎকার ডোরাকাটা গ্যালাক্সি—
কী সুন্দর রামধনুরঙের গ্যালাক্সি!
আজকে তাদের অন্তর্বর্তীকালীন আকাশের মাঝখানে
কোথাও-বা কোনো তথ্যবিন্যাসে,
সংকেতপ্রবাহে
অতর্কিতে বেঁধে যায় গোলযোগ।
আন্তঃভৌবনিক তথ্যজালিকায় আচম্বিতে লেগে গেছে জট।
আর একবার লেগে গেল কি, অমনি মুহুর্মুহু জটের পর জট।
গোলযোগে ভরা সেই গায়েবি জালের নানা গ্রন্থি থেকে,
ফেঁসে-যাওয়া, আচমকা ফাঁস হয়ে যাওয়া নানা তথ্যতন্তু থেকে
অনর্গল বিকিরিত হচ্ছে আজগুবি সব কথা—
খাঁটি-খাঁটি তথ্যগুলি সব গোলযোগের দরুন
কেমন বিকারপ্রাপ্ত হয়ে গুজবের রূপ ধ'রে
বেরিয়ে আসছে।

মাঝে-মধ্যে অদ্ভুত আশ্চর্য সব কথা (কত কথা!)
কল্পিত মারের কথা আর পরিকল্পিত প্যাঁচের কথা
গভীর গিঁটের কথা, কখনো-বা নেহাত মামুলি মারপ্যাঁচের কথা।
আর
উর্ণায় উর্ণায় ভরে দিয়ে যাচ্ছে আগামী ভুবন, ভবিষ্যৎ।

এদিকে আমিও কিছু কথা পাঠিয়েছিলাম তোমা-প্রতি।
কিন্তু কী যে হবে! এই নিখিল নিস্তারহীন জালিকাবিন্যাসে
কোন্ স্ট্রিঙে, কোন্ লুপে, কোন্ ম্যাট্রিক্সে, কীভাবে যে ফেঁসে বসে আছে
সেইসব ভীরু বাক্যাবলি!

দুপুরের এই নিঝুম প্রীতিব্যবস্থা ভেঙে, আর আমি
সেই সব হারানো বাক্যের খোঁজে
বেরিয়েছি একরোখা রাখালের মতো।

কিছুক্ষণ আগে, তবুও যা হোক নামিয়ে দেওয়া হয়েছে বিশ্বের
বাঘা-বাঘা সব ট্রাবল-শুটার;
পাকা উদ্বিড়ালের ভঙ্গিতে ধরে ফেলছে ট্রাবল
একটি একটি করে, আর অমনি শুট করে যাচ্ছে সটাসট।
দেখা যাক, কতদূর কী হয়!
আশা তো করছি,
তোমা-প্রতি প্রেরিত হারানো কথাগুলির হদিস
পাওয়া যাবে দ্রুত
এবং
একেবারে অবিকৃত সদ্‌সদ্‌রূপে
পৌঁছে যাবে তোমার নিকট।

আজ
স্বপ্নমধ্যে উদ্‌যাপিত ভিন্ন উড্ডয়ন
বেগের দিনে আজকে হঠাৎ অবাক মন্থরণ!

ওসমান লঞ্চ ফেল করেছিল

ওসমানকে ফেলে রেখে লঞ্চ ছেড়ে যায়।
মেয়েকে নিয়ে ওসমান ধীরে ধীরে হাঁটছিল
আর পায়ে পায়ে জড়িয়েছে দুনিয়ার যত দুর্ভাগা দাঁড়ি-কমা
সেমিকোলনের ঝাড়।
ওসমানের ফেস-ভ্যালু দপ করে নষ্ট করে দিয়ে
অল্পের জন্য লঞ্চ ছেড়ে যায়।
মেয়েটি ধ্যাক করে বসে পড়ে।
হাহাকার করে ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে ভেঁপু দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে.....

এরপরে শুরু হয় কিছু অভূততপূর্ব ঘটনাপ্রবাহ.

বিশ্বের প্রতিটি প্রজাতি থেকে একজন করে বলশালী উঠে এসে পুরুষে পুরুষে নদীকূল ভরে যায়
দুই পারে ওসমানের কাঁপা-কাঁপা ট্র্যাজেডি নাটকে বহুদূরে কাকের আভা-মাখানো বালিয়াড়ি-বাঁকে
তিন দিকে দাঁড়ানো ঝাপসা তিনজন — বোর্হেস, ফ্রয়েড আর ক্লিনটন —মাথায় শিরস্ত্রাণ, কোমরে
দুই হাত, ফ্রয়েডের দাঁতে-কাটা ধোঁয়াময় চাউস চুরুট; তিন গ্ল্যাডিয়েটর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূরে এই
দৃশ্য দেখে। নতুন নভোযান হঠাৎ হাত ফসকে উড়ে গেলে মহাবিজ্ঞানীরা যেভাবে তাকিয়ে থাকে
শিশুর বিস্ময়ে, সেইভাবে। নদীর দুই পারে সার সার দাঁড়ানো গোলচশমা বকের মতন যুগের
যুগের খলবল-করা কিংসাইজ সব জিনিয়াস আজ কেমন নিরুত্তর, হায় কী প্রয়োজনহীন আজ
তারা! তামাদি হচ্ছে আজ দিস্তা-দিস্তা সব চকচকে অফসেট কথা যুগের যুগের। বহু যুগের ওপার
হতে বাক্য আহা আসমানি রঙের সব আকাশী বাক্য কিছুটা ফ্যাকাশে করে দিয়ে ওসমানকে ফেলে
রেখে হাহাকার করে ভেঁপু দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে লঞ্চ ছেড়ে যায়। নদীবক্ষে আর যত জলজ মগ বর্গি
ওলন্দাজ, একেবারে টাস্‌কি মেরে পড়ে আছে সব দস্যুডিঙায়-ডিঙায়, এই দৃশ্যের অব্যবহিত
পরে। ওই তো আবছা দেখা গেল, ঝাঁকি দিয়ে জ্বলন্ত চুরুট ফেলে কাকদের ডানায় আচমকা ঘুরে
দাঁড়িয়ে সমস্বরে বলে ওঠে ফ্রয়েড আর বোর্হেস —এ কী হেরিলাম, হায় মরি মরি, জগতের অপূর্ব
বিস্ময়, চিরপ্রশ্নময়, এ কি অধ্যাস? কিচ্ছু মানে বুঝি না এই প্রহেলিকাময় লঞ্চ ফেল করার।
ক্লিনটন স্তব্ধবাক, সময় বহিয়া যায় তরল মলের ন্যায় বেমালুম, নানা সম্পাদ্যের, যুদ্ধের আর
বিশ্ববরাদ্দের। ওসমানকে ফেলে রেখে হাউৎ করে কেঁদে উঠে ভেঁপু দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে লঞ্চ ছেড়ে
যায়।

নষ্ট হয়ে যায় মাংসমূল্য যত সুস্বাদু মেষের
এই তীব্র কাঁপা-কাঁপা ওসমানময় আবহাওয়ায়।

দুপুরের এক শূন্য বন্দর

বন্দরের অনেক ওপরে
প্লুতস্বরে
দুপুরবিলাসী এক সুতাকাটা ঘুড়ি
চি... ...চি... ...ডেকে ডেকে কক্ষপথে ঘোরে
জেটিতে দাঁড়ানো এক বিপুলা জিরাফ, তাকেই কেন্দ্র ক'রে।

(অন্যদিকে গাঙচিলের কক্ষপথ স্পাইরাল।)

গাঙচিল
ওই ঘুরে
ঘুরে নিচে
নামছে
এক পাক
নামছে,
অমনি
ঝিলিক-পালকে তার
মৃদু জং
ধরছে—
আর পাক
নামছে,
চকচকে
পালকেই
আরো জং
ধরছে।

ডানা থেকে
ঝুরঝুর
জং ঝরে
পড়ে
ঘুমঘুম
লালজামা
কুলির ওপরে।
ঘুমঘোরে
কুলি ভাবে,
লাল খুদ
ঝরছে

ধুত্তোরি,
মহাকাশ
থেকে খালি
রেশন ছিটাচ্ছে।
যেইরূপে
আজ দূরে
দূরে
ওরসের
দিনে ঝরে
লাল চা'ল
পীরের ওপরে।

আজ সমগ্র শহর ঘুরে ঘুরে দেখলাম

নিদ্রিত শহরে, রাত ৩টায়.

দীর্ঘলেজ অনেক নেউল,
এ-কোন্ তরিকামতে
পাল্লা দিয়ে ছুটছে মাইক্রোতরঙ্গের সাথে
টাওয়ার থেকে টাওয়ারে
পোলাও চালের মতো ঘ্রাণ
ছড়িয়ে শহরে।
আমরা আঘ্রাণ করি, নিদ্রিত শহরবাসী—
টিপটিপ আলো-জ্বলা বহু ঘুমঘুম টাওয়ার-ছড়ানো রাতে।

উপশহরে, সন্ধ্যা ৭টায়.

যক্ষনিম বৃক্ষের পত্তন হলো শহরের উপকণ্ঠে
দিনে বিড়ালের দুধ খেয়ে বড় হয়ো বাছা,
রাতে পূর্ণ গোলাকার হয়ে যেয়ো ওহে তুমি ওহে নিখিল রেশমচোর,
তাঁতের আড়ালে, বয়ন-মশগুল খোদ মহাতাঁতীর পায়ের কাছে ব'সে
কেবলই রেশম চুরি করে যাবে একটানা অর্ধচাঁদের রাতে।

শহরের পুরাতন অংশে, বিকেল ৫টায়.

নগরঘোষের উচ্চ দূরাগত ঘোষ, নিলামের—
এখন মিলিয়ে-যাওয়া বিমানের সিল্কি গুঞ্জনের মতো রাতে।

শহরের নতুন অংশে, দুপুর ২টায়.

আগাগোড়া
স্টেনলেস স্টিলে মোড়া
ভেসে যায় বিপুল জাহাজ।
ঘাসে আর গাছে ঢাকা পার্ক
বড়-বড় লাফ-দেওয়া ঘোড়া
আলোঢেউ সুপারমার্কেট
সুইমিং পুল, মিষ্টি পানির পুকুর
হুল্লোড়িত স্টেডিয়াম
সব আছে গিয়ে দ্যাখো ওই জাহাজে।
কেবল জাহাজ ডাকিয়া যায়
ভূতে-ধরা অধ্যাপকের ন্যায়।

দুপুর-মাখানো ওই উঁচু মাস্তুলে, চিমনির গায়ে,
জাহাজ-প্রান্তরে হালকা অফসেট বাতাসের পাতে

একেবারে পেস্টিং করে লাগানো সব চকচকে চিল,
উড়ন্ত ভঙ্গিতে একদম ফ্রিজ করে দেওয়া সচিৎকার—
গিয়ে দ্যাখো ওই জাহাজে।

কেবল জাহাজ ডাকিয়া যায়
আক্রান্তা অধ্যাপিকার ন্যায়।

মিটমিটে বহু ভূতবাতি
এককালে মুদ্রিত আহা দূরের বন্দরে।

খাদ্যবিষয়ক একটি প্রতিবেদন

(কবি স্যান্ড্স্, স্মরণে এলেন সহসা বহুদিন পর)

খাদ্য—এক অভিনব আবিষ্কাররূপে
ঝাঁঝালো ম্যাজিক-কাহিনীর রূপে
জড়িয়ে রয়েছে এই ধূসর প্রকৃতিপুঞ্জে
নিসর্গের ধমনীসংকেতে
বিভিন্ন অধ্যায়ে।

বহুকাল আগে
ঝোপঝাড়ে, প্রাচীন প্রান্তরে, গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটে থাকা
সব পাকা মরিচের অপরূপ রূপে মুগ্ধ
সেই এক প্রথম মানব, শিশ্নোদর,
কী এক অচেনা অন্ত্রবিক্ষেপে
প্রথম ক্ষুধায়
একেবারে কিংকর্তব্য, দিশাহারা;
প্রলুব্ধ শিশুর মতো যেই স্বাদ নিতে গেল সে-পাকা ফলের,
আচমকা আহত ও প্রতারিত, তীব্র স্বাদভঙ্গের আঘাতে।

ইতিহাসে এই ঘটনাটি
'খাদ্যের প্রথম প্রতারণা মানুষের সাথে' নামে অভিহিত।

তারপর বহু উদ্ভ্রান্তির যুগ পার হয়ে গেছে।
খাদ্য—এই চিরস্পর্শকাতর দ্রব্যটি
এই যে স্পন্দনশীল চমৎকার দাহ্য ধারণাটি, তারও
কালে কালে বহু অভিভাবক হয়েছে।
নকশা নানাবিধ।
আঁকাবাঁকা বহু গতিপথ বহু উৎপাদনরীতি পার হয়ে হয়ে...
স্প্রিং-এর মতোই স্পন্দমান আর প্যাঁচানো প্যাঁচানো
বহু গতিধারা তার...

দিন যায়
আবেগে আবেগে আরো নানা রকমের দিন বয়ে যায়।
অতঃপর একদিন
এই শীতসময়ের একজন অত্যন্ত মানুষ
কী যে স্নায়ু-টান-টান-করা জেদে একটানা ছেষট্টি দিন অনশনশেষে
কথিত সুশীল জগতের সাজানো মঞ্চ থেকে
সবেগে প্রস্থান...

আর অব্যবহিত পরেই ভূপৃষ্ঠের যত
অভিজাত খাদ্যরাশি, হঠাৎই, তাদের
বিবিধ ব্যঞ্জনা আর সমস্ত দায়িত্ববোধ হারিয়ে হারিয়ে
একযোগে পুরাপুরি পাগলা ও অর্থনাঙা হয়ে
এলোমেলো দায়হারা নির্ভার বেড়ালো ভেসে কিছুক্ষণ
তা অন্তত বেশ কয়েক মিনিট।

এইবার, এই ঘটনাটি কোন্ অভিধায় উৎকলন করে রাখি
ইতিহাসে, সোনালি সেগুনপত্রেপত্রে?

২৬ বছর পরে পিতামহের একটি অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল

খাঁ-খাঁ খিলক্ষেতে ভরা নদীর পরপার। অচিরাৎ এক অশ্বত্থবুড়ো।
চলাচলের কোনো সুরাহা নাই ওদিকটায়। চলেও না কেউ সচরাচর।

একবার এক মোকদ্দমার তিথি; শহর হলো অভিমুখ আমার পিতামহের।
উষাকালে উষ্ণ তণ্ডুল, তরলবিজড়িত।

সেই খাঁ-খাঁ মাঠ দিয়ে ফাঁকা পিতামহ একা-একা যা রৌদ্র তা ক্ষিপ্ত-চকচকে চিতার শাবক। জিরিয়ে নিতে ওই অশ্বত্থের নিচে; আর অকস্মাৎ একজন আগন্তুক। ঢোলা পরিচ্ছদ। কাঁধে ঝোলা। বিশাল দেহসংগঠন। সংগঠনটি কোন্ কালের এবং কোন্ দেশের—খুব দুরূহ। লালচে দাড়ি। বালিমাখা দীর্ঘ-দীর্ঘ আর স্তরে-স্তরে চুল ওড়ে তার অন্তত চার হাজার বছর আগেকার কোনো নগর-সন্নিহিত মাঠের ভুট্টাচাষী—পিতামহ যেমতো ভেবেছিলেন। (ঝোলার ভেতরে ছিল কি প্রাচীন ভুট্টাবীজ?)

বরফ ভেঙে ফেললেন আগন্তুক অবিকল বাংলাভাষায়। কিছুটা বন্যমৈথিলী। 'কী, মোকদ্দমা? রায় হবে আজ?' তারপর দু-চারগুচ্ছ ভাষাবাণিজ্য পিতামহের অনুকূলে। তারও পরে যুক্ত করলেন করযুগল (আগন্তুক কি ক্যারিজ্‌মা দেখাচ্ছেন কোনো!)। যুক্তকর বেয়ে দুধের ধারা কনুই অবধি তার। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ। 'যান, এবং নিশ্চিত, এ মামলায় আপনারই জিত'—দিবালোকে সেই এক অচেনা আগন্তুক, দিবালোকে তার সেই অভূত-অশ্রুতপূর্ব ক্রিয়াকাণ্ড এবং বাচন, পিতামহের কূপে কূপে রোমকূপে ঘন শিহরন। 'আচ্ছা আসি' ব'লে কম্প্র পিতামহ দ্রুত মোকদ্দমা অভিমুখে।

সেদিন এজলাসে যে-হাকিম, দেখতে ওই আগন্তুকের মতো। সেদিন টগরাই হাটে মানে বিদেহনগরে আর সিলিমবাজ শহরে তারস্বরে নিলামের ডাক, শহর উঠল নিলামে, দূরদেশ থেকে ঘোড়ায় চড়ে আসা পাগড়িপরা যে-লোকগুলি—অনেকটা ওই আগন্তুকের মতো। ফিরতিপথে বহু দিনের বহু সাধের মামলায় হেরে যাচ্ছেতাই ভূত হয়ে বাড়ি ফেরার পথে, কাওয়াকোলায়, বিভোর মেলার মধ্যে দ্রুত ঘূর্ণায়মান জুয়ার চক্র—জুয়ায়-বসা লোকটিও ওই পথিকের মতো...

আমার পিতামহের পক্ষে ঘটনাগুলো রোমহর্ষনাদ। আসমানের সকল সিদ্ধান্ত আর ভূপৃষ্ঠের সমস্ত মীমাংসার ঊর্ধ্বে এইসব ঘটনা অদ্যকার—তাঁর ভাষা। আমাদের পক্ষে ছিল অতীব বিস্ময়। আমরা না পারছি বিশ্বাস, না অবিশ্বাস। কারণ, তিনি আমাদের শাক্ত পিতামহ মিথ্যা বলেন না। তদুপরি রাতের খাবারের সময়, তাঁর পুত্রবধূ, তার সর্বদিবসের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী পুত্রবধূর সামনে সকলকে এই ঘটনার বর্ণনা এবং শিউরে শিউরে, এবং পিতামহ, আমাদের সলিড পিতামহ, অতিদাহ তামার মতোই তরলায়মান।

বহুদিন খুঁজে খুঁজে এসব ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা না পেয়ে অবশেষে নিদানকালে সকল ঘটনা তার মৃত্যুশিথানের বাম পাশে অমীমাংসিত রেখে, হায়, দড়িবাঁধা শিশি-হাতে টগরাই হাটের দিকে সেই

যে চলে যায় পিতামহ, দুঃখিত চিতাবাঘের মতো হেটমুণ্ডু লঘুপায়ে..., আর গরিব হাটুরে হাটবেলা নাহি পায়।

বহুকাল পরে তাঁর পৌত্র, এই আমি, আজ টিনের চালের নিচে দাঁড়িয়েছি জানালার ধারে। সামনের খোলা প্রেক্ষাপটে ঝমঝম মুদ্রায় বৃষ্টি। অভিলাষ জাগছে ধীরে ধীরে—এই প্রবল বর্ষণ যেন আর না থামে কোনোদিন। এখন বসনিয়া বাগদাদ অযোধ্যায় ঘোর বৃষ্টি, একাত্তরে বৃষ্টি, পড়শির টিনের চালে চালে বৃষ্টি, উৎফুল্ল ব্যাঙসকলের পিঠে পিঠে বৃষ্টি—আর এইসব মহামহান বিষয় ছাপিয়ে পিতামহের ওই ক্ষুদ্র ভাবকাতুরে বিষয়টি, বারবার দাবিয়ে দিচ্ছি, তবুও কেমন বড় আর গুরু হয়ে উঠছে।

ধারাপাতগীতি : শ্রাবণে ও শৈশবে

সকল বয়স ফিরে যেতে চায়
বালকবেলার ভোরে
সব ইতিহাস লেখা হতে চায়
শ্রাবণে নতুন করে।

শৈশবকালে অঝোর শ্রাবণে
হয়েছিল সাক্ষাৎ
এতটা বয়স উজিয়ে এসেছে
অবাক, সে-ধারাপাত!

এসেছে যখন ঝরুক অঝোরে
দেশে ও দেশান্তরে
উচৈচঃস্বরে ধারাপাত হোক
শ্রুতিকে বধির ক'রে।

ধারাপাত হতো পাঠশালা আর
পড়শির আঙিনায়
আজও দেশে দেশে পুরাতন ধারা
নতুন এক ঘরানায়।

ধারাপাতদেরই সংখ্যারা ঝরে
ফোঁটা ফোঁটা অক্ষরে
সংখ্যাধারাই বিবেচিত হয়
বৃষ্টি, মতান্তরে।

পড়শিরা হায় কোথায় যে যায়
কে যে আজ কোন্ ভুবনে!
এক বর্ষায় ভেসে ওঠে তারা
ঝাপসা অন্য শ্রাবণে।

ইচ্ছামতন ধারাগান গেয়ে
যাচ্ছে ইচ্ছামতী
বিচিত্র সুরে ফুলকি ঝরিয়ে
সুরের সরস্বতী

ডুবিয়ে জরুরি কথা ও কথিকা
একটানা ধারাভাষ্যে
বৃষ্টি-বাতাসে ভীষণ বাহাস
বইয়েছে লীলালাস্যে।

ভেসে যায় কালো কাফ্রি মেঘেরা
গগনবিহারী দাস
উর্ধ্বে তাদের খাঁ-খাঁ বৈশাখ
নিম্নে শ্রাবণ মাস।

(আসমানভরা ঘন ঘনঘটা
কালো কালো কার্পাস
নিচে যে তুমুল বৃষ্টিচর্চা
ওপরে রৌদ্রাকাশ।)

শ্রবণ ভিজছে মনন ভিজছে
ভিজছে দেহের দাহন
এরই নাম কহে ভিজে যাওয়া, আর
এরই নাম অবগাহন।

ছড়িয়ে পড়ছে এই ধারাপাত
ভূতে ও ভবিষ্যতে
শাসন করতে ভেজা দেহমন
নতুন ধর্মমতে।

পরিভ্রমণ, দূরের আকাশে

আজকে হঠাৎ যেন কোথাও কিছু নেই, এ অঞ্চলে।
পুরাতন, রুগ্‌ণ নভোচারীদের মহাকাশে ত্যাগ-করা সেই কবেকার
দু-একটি বিশুষ্ক বিষ্ঠা আর কিছু ছেঁড়াখোড়া বহুরঙা বস্ত্রখণ্ড শুধু
মিটমিট করে ভেসে বেড়ায় নির্ভার নিরাশ্রয়
আকাশের লঘু অভিব্যক্তির মতন।

সে-কোন্ ভুবন হতে, মহাদূর, বীজাণুবাহিনী এসে
খুব দ্রুত মুক্ত করে দিতে থাকবে ওইসব নিরানন্দ
পুরীষে পুরীষে, বস্ত্রে বস্ত্রে, প্রায় চিরটাকালের মতো আটকে-পড়া
বহু বীজসম্ভাবনা—
এই এক অস্পষ্ট অভিপ্রায়মাত্র হায়!
ওটুকুই আজ জেগে জেগে, কেঁপে কেঁপে,
বারবার ব্যাপ্ত ও বিলীন হয়ে বিরাজ করছে
বিভিন্ন নীলের মধ্যে, স্তরে স্তরে, স্তরপরম্পরায়!

ওই ছোট্ট অভিপ্রায়টুকুই নাকি, শোনা যায়, জড়িত রেখেছে,
কিছুটা স্পন্জিত করে রেখেছে কুয়াশাভাবে, এক
পূর্বাপর ভয়েড ও ভ্যাকুয়াম-রাজের একাংশ।

প্রতিবেশীদের কথা

আমাদের দক্ষিণে কৈবর্তপাড়া এবং উত্তরে আদিবাসী-গ্রাম।
পূর্বে ঢেউথইথই নদী, স্নেহলক্ষ্যা, স্নেহপালিত অগণ্য মৎস্যকুল—
বক্ষে ঠাঁই পাওয়া লক্ষ সন্তান, ধীবর, জলে-ভাসা জলজন্ম বেদের বহর।
পশ্চিমে অরণ্য—
মর্মে মর্মে তার ঘুরে বেড়ানো চঞ্চল প্রাণিকুল।
নীচে ভূমিগর্ভ, অথই অতল
সোনালি বাদামি নীল ঝিলমিল ধাতু ও তরল।
উর্ধ্বে নীলাকাশ, তারাভরা, জগতের মায়াবি প্রবোধ
সোনালি রুপালি পাখি, বিজলি, চমকে-ওঠা মেঘবৃষ্টিরোদ।
আমাদের ঈশান চারণভূমি; এবং নৈর্ঋত দিক্‌চিহ্নহারা, অকূল দরিয়া...
এইভাবে আমাদের দশ দিকে দশ রকমের প্রতিবেশী।
আমাদের এই গ্রামখানি ঘিরে গড়ে ওঠা দশভুজ,
অনেক সাধের, সাধনার এই দশভুজ।
আবার এদিকে মা দুর্গা, দশভুজা, তাঁর অনুগ্রহ, তাঁর অধিষ্ঠান
সে-ও শুনি আমাদের এই ভুবনগ্রামেই!—দশ দিগন্তে বাড়িয়ে দেওয়া দশ হাত।
টানটান স্নেহে আগলে রাখতে চাইছেন প্রাণপণ
আমাদের দশ রকমের পড়শিকে।

আমরা এবং আমাদের দশ দিকে দশ প্রতিবেশী—
এই যে আমাদের চিরদশভুজ,
এই যে জটিলমধুর দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্ব প্রীতি আর সম্প্রীতি,
এভাবেই হয় তবে প্রতিবেশচর্চা, আমাদের?!

প্রতিবেশ বাঁচে নাকি পরস্পর প্রতিবেশিতার সুবাদেই!?

যা হোক, প্রতিবেশীদের নিয়ে এই যে কথাগুলি বললাম,
এ ব্যাপারে প্রতিবেশবিদ, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিবিদ, এঁরা তো বটেই,
এমনকী আপনিও, এমনকী আবারও, এমনকী অবশ্যই, ফলাতে পারেন ভিন্নমত
হাওয়া ও অনল এখন এতটাই অবাধ, সুগণতান্ত্রিক।

যোগাযোগ

তোমাকে মনন করি বিভিন্ন ঋতুতে
বসন্তে শরতে কিংবা মার্গশীর্ষ মাসে
আর তারই আবেশে সৃজিত হও বিন্দুবৎ
একটু একটু করে
জন্মজন্মান্তরে...

এই যে এতটা দূরে থেকে তোমাকে মনন করি বিভিন্ন ঋতুতে
খুশিতে সুগন্ধে কী যে অব্যাহত হয়ে থাকি সারা ঋতু!
সর্ব-অবয়ব দিয়ে তোমাকে মনন করি, আর
তারই কি প্রভাবে তুমি প্রকাশিত হও
জ্বলজ্বলে দূর পুষ্পবিন্দু হয়ে? মাঝে মাঝে? বিরল ঋতুতে?

সর্ব-অঙ্গ দিয়ে তোমাকে মনন করি, আর
তুমি দূরে, গোলক-বাহিরে, অন্য ভুবনে, নিজস্ব
পরম্পরা থেকে সেই অনেক বাইরে,
নতুন উজ্জ্বল এক আইকন হয়ে ফুটে ওঠো।

এরপর ওই পুষ্পের, রূপের, বহু পাঠ হলো, পাঠান্তর হলো ঋতুতে ঋতুতে,
বহু বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে ঝাপসা হয়ে আসে
ওই আইকন, স্নিগ্ধ রূপবিন্দু আমাদের।

এই কি সেই বিন্দু ধ্রুববিন্দু
যথা হতে যাত্রা যাবতীয় জ্যামিতির?
বিন্দুই করেছে নাকি সূত্রপাত সকল আকার,
আকারে-বিকারে ভরা যাহা এই অনিত্য সংসার!

এদিকে বিভিন্ন ধূলি আর ধারণার মধ্য দিয়ে ডুবে যেতে যেতে
যুগে-যুগান্তরে নানা রকম জ্বরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে
ক্রমশ প্রাচীন হয়ে আসে এই দেহ—
ধর্মের চেয়েও প্রাচীন এই দেহ, এই তোবড়ানো ভাণ্ড, ছেয়ে যাচ্ছে
বল্মিকে বল্মিকে
মননের উৎসগুলি নিভে আসে ধীরে; যোগাযোগের সকল পথ রুদ্ধপ্রায়—
আর আমরা ক্রমেই জড়িয়ে পড়ি, পড়তে হয়, এক অজানা বাল্মীকিচক্রে।
এবং এখন
যুদ্ধ ভিন্ন অন্য যোগাযোগের উপায় আর খোলা রইল না
তোমার সহিত।

যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো যোগাযোগ নেই এ-পর্যায়ে।

রূপকথা থেকে উৎকলিত

১.

দূরদেশে দূরকালে ছিল বেশ কয়েকঘর মজার সংসার—
যে-সংসার দরিদ্র, দুর্বল,
কিন্তু তীব্র তিরিক্ষি মেজাজ, অভিভাবকের—
পোষ্যদের ওপর কায়েম রাখত সে লাগাতার নিষ্ঠুর সন্ত্রাস।
অথচ বাইরে, বহির্সংসারে,
অন্য সব সংসার-সংস্থার কাছে
কেমন বিনয়ী আর নম্র! আর কিছুটা লাজুক।
এই নিয়ে পোষ্যকুল করত
আড়ালে আড়ালে উপহাস।
আর অভিভাবকটি,
লজ্জাপ্রাপ্ত কিছুকাল।

২.

যেরকম, দুর্ভিক্ষের কালে
গ্রামাঞ্চলে, গভীর রাত্রিতে,
ভয়াবহ গোপনীয়তার মধ্যে
ফিসফিসিয়ে জ্বলে ওঠে দু-একটি বিরল উনুন
অনেকটা গোপন বিপ্লবের মতো,
সেইরূপ—

পথ

একটি নতুন দেশ যখন আবিষ্কৃত হলো, দেশে দেশে খুব সাড়া পড়ে গেল। সে কী চিত্তচাঞ্চল্য! কলে ও কব্জায়, বাহনে ইমারতে, টেক্সটে সিলেবাসে আর নথিতে নথিতে। সবচেয়ে চঞ্চল দেখলাম একটি গ্রামীণ পথকে। আঁকাবাঁকা, উদাসীন। সেইসব উত্তেজনার দিনগুলিতে সবাইকে শান্ত থাকার জন্য তারস্বরে আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, পথটি নেই। উঠে চলে গেছে, ভোর হবার আগেই। যেন উধাও-বেগে ধাবিত হয়েছে কোথাও দেশ-দেশান্তর পার হয়ে সম্ভবত সেই নতুন দেশের টানে, পড়ে আছে শুধু পথটির অস্পষ্ট বয়ে চলে যাওয়া। সর্পিল সঞ্চারচিহ্নটুকু শুধু।

আমরা পল্লিতে পল্লিতে পথটির অনেক খোঁজ করলাম। জনে জনে জিজ্ঞাসিলাম। নাঃ, কোথাও নেই। কিছুটা বিস্ময় ও বিষাদ নিয়ে ফিরে চলে এলাম। কয়েকটি গ্রামহরিণের বাচ্চা পথ শুঁকে আমাদের পিছে পিছে অনেকদূর পর্যন্ত চলে এসেছিল।

বীজ ও বপনকেলি সংবাদ

আর আবিষ্কৃত হচ্ছে যখনই নতুন কোনো শস্য আর নতুন ফলন
তখনই, অবাক কাণ্ড, বংশে বংশে আবির্ভাব নতুন শাস্ত্রের!
ফলনে উৎসবে প্রীতিপ্রফুল্লম্ ফসল কাটার দিনে
আজ শস্যজ্যোতির ঝিলিক লেগে উদ্ভাসিত সর্বাঙ্গ, গোত্রের।

আর আমাদের এই অনুষ্ঠানে কোনো পশুহিংসা নেই
ঘূর্ণনশীলতা নেই, প্রকার-পদ্ধতি নেই
কেবলই ভেজিটেশন—
জোনাকিখচিত চিরবসন্ত ভেজিটেশনে ঘেরা অনুষ্ঠান।
দূর থেকে শুধু ভাসতে ভাসতে আসা এ উৎসবে
কেবলই উজ্জ্বল স্নিগ্ধ ঘ্রাণের রেখাটি ধরে ভেসে আসা
আর ভেসে যাওয়া...ঢেউয়ে ঢেউয়ে,
সবুজ সবজিতে ছাওয়া এ এক নতুন ধর্মাচার।

এখন বপনঋতু।
লাঙল-অঙ্কিত সারি-সারি খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে বীজ
ওই যে একটি দীর্ঘ হলরেখা
আলবাঁধা আয়তক্ষেত্রের সীমা ভেদ করে
মাঠ-মাঠান্তর চিরে চিরে...যেন-বা উধাও হয়ে চলেছে কোথাও
সে-কোন্ প্রান্তরান্তরে—কালাকালহীন, দিকচিহ্নবিহীন!

চন্দনকাঠের আজি নতুন লাঙল
আর ফলাখানি তার সুরভিধাতুর!

লাঙলের পিছে পিছে ইলশেগুঁড়ির মতো ঝরছে বীজ
গুঁড়িগুঁড়ি ইলিশের রেণু।

চন্দনকাঠের আজি নতুন লাঙল
ফলাটি তাহার আহা সুরভিধাতুর।

এবং এখন, এইমাত্র, দেখতে না দেখতেই
ওই অন্তহীন হলচিহ্ন ধরে, ওই চন্দনগন্ধের সুর ধরে
সুরের সূত্রটি ধরে লাফিয়ে চলেছে সব
নতুন চকচকে ইলিশের চারা।

ওগো আজ বপনদিনের মুগ্ধ মধুর বাতাস,
বার্তা বয়ে নিয়ে যাও এই অভিনব বীজ আর বপনকেলির
নিয়ে দাও ভাসিয়ে প্রচারে, সম্প্রচারে,
কোনো এক দূর সান্ধ্যকালীন অজ্ঞাত শস্যবেতারে
নতুন বৃষ্টির দেশে, অন্য এক অভিনব ইলিশকৃষ্টির দেশে।

ইতিহাস

কী করে সম্ভব তবে পৃথিবীর সঠিক ইতিহাস? কারণ, যিনি লিখেছেন, তিনি কে এবং কোথায়? কোন্ সময়ে, কোন্ অবস্থানে দাঁড়িয়ে কী উদ্দেশ্যে লিখছেন, সে-সবের ওপর নির্ভর তার ইতিহাস। আর তা ছাড়া বিষয়টি বিষয়ীগত, সাবজেকটিভ।

তবে কি সত্যিই অসম্ভব সঠিক ইতিহাস?

—না। ভূমণ্ডল হতে এ যাবৎ যত আলো বিকীর্ণ হয়ে চলে গেছে সে-সবের মধ্যেই মুদ্রিত হয়ে আছে পৃথিবীর ইতিহাস, কালানুক্রমিক। অর্থাৎ পৃথিবী হতে বিচ্ছুরিত আলোর ইতিহাসই পৃথিবীর ইতিহাস। আর তা-ই হচ্ছে প্রকৃত ইতিহাস, কেননা তা লিখিত প্রাকৃতিকভাবে। এই নিখিল নভোভারতের রাজ্যে রাজ্যে বসে দূরবীণ দিয়ে সেগুলি টুকে নিচ্ছে হয়তো-বা কেউ কেউ—আমরা জানি না।

তবে সে-ও কি হবে সঠিক ইতিহাস? কেননা, ইতিহাসের সেই সব অধ্যায়, যেগুলি কালো এবং অন্ধকার? সব আলো শুষে নিয়ে নিয়ে যেগুলি কালো ও কলঙ্কিত হয়ে পড়ে আছে? যেগুলি থেকে কোনোকালেই আর বের হয়নি এবং হচ্ছে না কোনো আলো? সেইসব?

তা ছাড়া সেই সব মানুষদের ইতিহাস, যারা কালো এবং কালচে তামাটে?

—হয়তো-বা দূরবীণে ঝাপসা হয়ে ধরা পড়ছে তাদের ইতিবৃত্ত, ঝাপসা মুদ্রিত হচ্ছে তাদের ইতিহাস—যেহেতু তারা যথাক্রমে কৃষ্ণ এবং ঊনকৃষ্ণ, যেহেতু তারা খুবই সামান্য আলো দিতে পারে বলে পৃথিবীতে প্রচারিত, বিচ্ছুরণে তারা প্রায় অক্ষম বলে প্রচারিত।

তাহলে কি কালো ও তামাটে মানুষদের ইতিহাস নিরন্তর ঝাপসাই থেকে যায়!? পৃথিবীতে!? এবং প্রকৃতিতে!? আলো নেই, তাই ইতিহাসও নেই!?

প্রবণতা

গ্রহটির পৃষ্ঠদেশ ঠিক এরকম ছিল না।

বহু মনু-মন্বন্তর পর আবার এলাম গ্রহটিতে। কত বদলে গেছে সব কিছু। এখানে নতুন এক ধরনের প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে—কেঁচোপ্রবৃত্তির এক প্রকার প্রাণী। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম—কেন্দ্রাতিগ প্রবণতাই এদের ধর্ম, এদের সভ্যতা। গোলকের অভ্যন্তর থেকে খননে খননে তুলে আনে বিচিত্র সব পদার্থ, ঝলমলে ধাতু শিলা ও তরল—সব কিছু পরিধির দিকে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে এনে জড়ো করে আর ইতস্তত কেঁচোর কীর্তির মতো সাজায় ঊর্ধ্বমুখী। সে-সব কীর্তির অনেকগুলি স্থির, স্থবির। অনেকগুলি আবার সচল, জঙ্গম।

এই গ্রহটির জন্য কোনো আচ্ছাদন নেই, আবরণ নেই, নিরোধব্যবস্থা নেই, অরক্ষিত। কথিত কেঁচোপ্রবৃত্তির ওই প্রাণীদের এ ব্যাপারে অবশ্য কোনো উদ্বেগও নেই। তাদের কেবলই উৎকেন্দ্রিকতা, কেবলই হিংসানিষ্ঠা আর লিঙ্গচর্চা আর অন্তহীন উন্মার্গগামিতা, দিন ও রাত্রিভর উন্মার্গগামিতা, আকাশ-ছোঁয়া অহম্, অভিমান...

উপপাদ্য

ধরা যাক, ছিয়াশি আলোকবর্ষ দূরের কোনো গ্রহের দিকে দূরবীণ তাক করে বসে আছি। একটু এদিক ওদিক ঘোরাতেই দৈবাৎ দৃষ্টিপথে চলে আসছে একটি ঘর। তার জানালা। জানালার ধারে একটি লালচে বালিকা। চুল আঁচড়াচ্ছে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। কিছুটা ঝাপসা। নাঃ, আর দেখাই যাচ্ছে না...

এখন আবারও দেখা যাচ্ছে মেয়েটিকে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ওই তো রঙিন পোশাকে রঙিন ব্যাগ-কাঁধে হেঁটে চলেছে ধূলিধোঁয়া-নিমজ্জিত পথে, না না, ধূলিধোঁয়া নয়, গুঁড়িগুঁড়ি রাঙারেণু বৃষ্টিঝরা পথে, সম্ভবত বালিকা-বিদ্যালয়ে...

এইমাত্র দেখলাম, একটি পাখি, পায়রাপ্রতিম, কিন্তু কেমন সোনালি, উড়ে গেল মেয়েটির সামনে দিয়ে। আর আগাগোড়া চিকচিকে রাংতায় মোড়া দুটি লোক হেঁটে আসছে উল্টাদিক থেকে।

সুদূরে, অতীতকালে কী যে রং ও রাংতার উচ্ছ্বাস!
রঙে আর রাংতায়...আর বৃষ্টিগন্ধ আদিগন্ত বসন্তবাহার!

আজ গ্রহটির দিকে তাকিয়ে এসব দেখছি আর উত্তেজনায় কাঁপছি। অথচ দৃশ্যগুলি অতীতের, ছিয়াশি বছর আগেকার। মেয়েটিকে দেখলাম ঠিক তার ছিয়াশি বছর আগেকার রূপে। না, কোনো ধারণ-করা চলচ্চিত্র নয়—গোলকটির দিকে সরাসরি তাকিয়ে এসব দেখছি এবং তা ইহচক্ষু দিয়েই (দূরবীণ তো আসলে চোখেরই একটি সম্প্রসার মাত্র)।

দেখছি ছিয়াশি আলোকবর্ষ দূর-কে, আবার একই সঙ্গে ছিয়াশি বর্ষ অতীতের সময়কেও।

অতএব, এখানে প্রতিপন্ন হচ্ছে আজ অনেকগুলি সিদ্ধান্ত—
এক. দূরবীণ আসলে এক অর্থে কালবীণও বটে।
দুই. অতীতকেও দেখা সম্ভব। নির্ভুল ও সরাসরি।
তিন. সুদূর এবং অতীত, চিরকালই রঙিন। বর্ণাঢ্য ও বৃষ্টিবহুল। যেমন দূরের বিদেশ, যেমন সুদূর শৈশব।

এর পরেও জেগে থাকে জিজ্ঞাসা, যে-জিজ্ঞাসা মূলত টানাপড়েন, পরা- ও অ-পরাবিদ্যার : কে ধারণ করে রেখেছিল দৃশ্যগুলি? কোথায় কীভাবে লুকিয়ে রেখেছিল এতটা বছর?

সে কি তবে আলো? আমার আঁখিতারায় ওই দূর মাধুর্যমণ্ডল থেকে ঝেঁপে আসা আলোর তরঙ্গ-উল্লাস? আলোদের অবিরাম ধাবনশীলতার মধ্যে ধরে রাখা সুদূর অতীত? এবং অতীতসহ ঝেঁপে আসা?

অতএব উঠে আসছে আরো একটি সিদ্ধান্ত—
আলো। আলো হচ্ছে চিরধাবনশীল এক অব্যর্থ ধারক-প্রপঞ্চ।
আলো হচ্ছে এক প্রাকৃতিক ভিডিও-রেকর্ডার।

এইবেলা তাই মুগ্ধ হয়ে গাই কিছুক্ষণ আলোর পাঁচালি.

আলো—
একইসঙ্গে একই অঙ্গে কণা আর ঢেউ, শক্তি আর ভর
একই তো আধারে, একাধারে, বস্তু আর ভাব, দেহ আর দেহ-অতিরিক্ত জ্বর।
একই অঙ্গে একই সে-আধারে রূপ ও অরূপ, রূপারূপ,
একইসঙ্গে দ্বৈত ও অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, গন্ধ ও গন্ধবিধুর ধূপ।
জগতের যত সৃজনকর্তা, যত পরমেশ্বর, সবাই দেখি দ্বৈতাদ্বৈত,
সবই দেখি রূপারূপ, স-ব দেখি পূর্বাপর আলোয় রচিত।

আলো—
তা সে যে ক্ষণেই রূপ, ক্ষণেই অরূপ বটে
যুগ যুগ ধরে পড়ে আছে সবে অদ্ভুত সংকটে—
সে কি বস্তু নাকি ভাব, রূপ নাকি অরূপ—কী দেবে তারে আখ্যা?
সে এখনই বস্তু, এখনই যে ভাব, ফের এখনই অভাব ব্যাখ্যার!

কামার প্রসঙ্গে

কামারের কুলীন বংশ.

তোমার বংশের নয়টি লক্ষণ
নয়টি ধারা করে প্রেরিত দিকে দিকে।
একটি ধারা গিয়ে মিশল ধারাজলে
একটি ঢেউ গিয়ে উঠল মহাকোলে।
তৃতীয় লক্ষণ বৃথাই ঘুরে ঘুরে
শূন্যে মহাকাশে নিখিলে নিরাকারে।
অপর ধারা হামাগুড়িতে-গুড়িতে
পৌঁছে গেছে দূর নতুন শতকে।

তোমার বংশের বিবিধ আচরণ
জড়িত করে গেছে অনেক প্রসঙ্গ।

আজ লোহা নেই.

আজ লোহা নেই, তাই কাজও নেই।
অবাক অচেনা এক ছুটির আমেজে
ঝিম ধরে কাত হয়ে, একেবারে কাল্পনিক হয়ে
বসে আছে কামার, আমার।

যুগপৎ কামার ও লোহার ওপর টিপটিপ শুল্কপাত.

অনেক শুল্ক জমে আছে কামারের
কোন্ দূর থেকে আর আনবে কান্তিলোহা!
টিপটিপ শুল্ক ঝরে লোহার ওপরে।
বালি থেকে বেছে বেছে হলদে চিকচিকে কণা
গড়ত সোনার অলংকার আগে,
তা-ও আর হয় না এখন।
আশপাশ থেকে হনুমানের আহ্বান ভেসে আসে
থেকে থেকে, আর
কেবলি শুল্কাতে থাকে শুল্ক তার অহং-প্রকাশপথে।

যে-লোকটি কামারের বংশ ধরে থাকে.

কামারের নবীন পুত্র, খু-ব কর্তুকাম,
অবিকল সরিষাভাষায় কথা বলে।
কত গৃহীজন আসে তারিখে তারিখে তার কাছে,
ব্যর্থ, অব্যর্থ, আর ব্যথায় ব্যথায় গতব্যথ কত গৃহী
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের!
কামার সবাইকে একাকার করে আগে পীড়নে পীড়নে।
তারপর
সরিষাভাষায় দীক্ষিত তারা হয়।

পিতা থাকে লৌহমগ্ন উদাসীন,
পুত্র, পক্ষান্তরে, সর্ষেলিপ্ত সারাদিন।

আর দূরগ্রামে, ওই যে, কাকদের যারা কাউয়া বলেছিল,
তাদের ছায়ার প্রতিফলনে ফলনে
তাহার অঙ্গের আটটি অবয়ব
অষ্টচিহ্নে, দ্রুত কাকলক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে থাকে।
আর দুষ্ট রোগে ধরে পুরনো কামারে।

এই বিশ্বে লোহা আর কামার যে-উপায়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হলো.

বিভোর বনের মধ্যে মাথা থেকে নিকেল খুলে রেখে
কামার যায় স্নানে।
ফিরে এসে আর পায় না।
বৃক্ষের সহিত মাথা ঠুকে ঠুকে...

নিকেল এখনো আভা করে রাখে জঙ্গলের পথ
যারা নৈশ, তারা ছত্রে ছত্রে পার হয়ে যায় অত্র জঙ্গল।

নিকেলে কখনো ঘুণ ধরবে না
দুষ্ট ঘুণ ধরে আজ পুরনো লোহায়
আর কামারের এত কাকুবাদ শোনার পরেও
দুষ্ট রোগে ধরে এই পুরনো কামারে।

সেই এক দেশ আছে

সেই এক দেশ আছে, যে-দেশে নানান প্রথা, নানা কথা, রীতি
যে-দেশে বনেদি চাঁদ, প্রজাপতি আর জংলি ফুলের সম্প্রীতি
আর দুগ্ধনদীতে প্লাবন তোলা সুশীলা কপিলা, ননী আর ননীচোরা...
যে-দেশে বেকার বসে থাকে, প্রায়-প্রায়ই, ডাকহরকরা—
কেননা সে-দেশে বার্তা নেই কোনো প্রেমবার্তা ছাড়া, আর তা বয়ে নিয়ে যায়
কখনো ভ্রমরে, কখনো তা গন্ধবহতা পবনে পায়রায়।
বস্তু ক্ষয়ে যায়, বাস্তু ধসে পড়ে, ধরে ঘুণ বটে অবশেষে
বংশে বংশে, বাঁশে, কিন্তু বাঁশি থেকে যায় নির্ঘুণ অক্ষয়, সেই দেশে।

যে-দেশে উজান বেয়ে চলে, প্রেমে, ভাটির ভাসান
স্রেফ ভালোবাসাবাসি দিয়ে যেইদেশে বহু মুশকিল-আসান।
যে-দেশে সুজন দেখে করলে প্রেম, মরলেও বাঁচাতে পারে
তারে! সত্যি-সত্যিই, এবং বারে বারে!

অরূপ রূপের সেই দেশে, রূপপুরে,
উড়ে চলো মন, ঘুরে ঘুরে
বেড়াই এ মনপবনের জাদু-উড়াননৌকায়
দূর-দূরান্তের নানা জেলায় জেলায়।

সহবর্ণা, সহজা আমার

ওগো সহবর্ণা, ওহে সহজা আমার,
চলো ডুবি, ডুবে যাই, ডুবি, মরি সহজ মরণ
চাঁদনি রাতে শান্তস্নিগ্ধ দরিয়ার মাঝে
জাহাজডুবিতে মরণের মতো আঃ কী শান্তি! রুপালি মরণ!

ওগো সহবর্ণা,
ও সহমরণা, অতিসহজা আমার,
সমস্ত নেশার চূড়া দেখা শেষ হয়ে এলে
চূড়ান্ত নেশার লোভে এবার জিহ্বায় লভে যাই শুধু
সাপের ছোবল...

পাল্টিয়ে নিই তরলে গরলে
মরণ পরস্পরে
বিকারের ঝোঁকে রেখা বেঁকে গিয়ে
বৃত্ত রচনা করে।

ভিন্ন বাস্তবতার মধ্যে হঠাৎ ঢুকে-পড়া কিছু লোক

এক জেলঘুঘু বারবার এসে ঘুরে-ফিরে দেখে যাচ্ছে
খাঁ-খাঁ মাঠে নতুন টাঙানো সাইনবোর্ড :
'কারাগার নির্মাণের নির্ধারিত স্থান'।
আর মৃত্যুতারিখ-নির্দিষ্ট কিছু লোক, কেউ কাউকে চেনে না,
রোগশয্যা ছেড়ে, গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে
দেখে আসছে যার যার কবরের বরাদ্দ জমিন—
যদিও তাদের ব্যাধি ও বিপন্নতা ভিন্ন,
বিষাদ ও নিঃসঙ্গতা ভিন্ন।

—কোনো কোনো শিশু আছে
এক অনির্ণেয় টানে বারবার পিছু নেয় অচেনা আগন্তুকের।
কিছু কিছু প্রেমিকও আছে
অজ্ঞাত তাড়নাবশে বারবার ঘুরে ফিরে আসে
বহু আগে ছেড়ে যাওয়া প্রেমিকার
পরিত্যক্ত ভিটাবাড়িটির কাছে—

এই মহাব্যাপ্ত দেশ ও কালের মধ্যে, এই
অন্তহীন সাইবার স্পেসের ব্যাপ্তির মধ্যে
তাদের আসন্ন কারাগার আর কবরের জন্য বরাদ্দ ওই
তুচ্ছ ক্ষুদ্র খণ্ড-খণ্ড ভূমিগুলিকেই ঘিরে একযোগে চমকাচ্ছে
ওদের সমস্ত ধ্যান জ্ঞান পরমার্থ,
মোম আর মাখন-মাখানো নানা স্বার্থ,
নানান রঙের দিন, দিনের উৎসব,
এবং মিছে এ-জীবনের কুহু-কলরব,
নাম ধরে হু-হু করে বেজে ওঠা সুদূরের সাইরেন,
আর ফুরায় এ জীবনের বহু লেনদেন,
আর ভয়, আর অভিমান
আর তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।
মধুতে বিষাদে মেশামেশি
তীব্র রাগ। অনুরাগরাশি।

ভিন্ন ভুবনের মধ্যে সহসাই ঢুকে পড়া ওই নিঃসঙ্গ মানুষগুলি—
কীই-বা তাদের আছে আর ওই ভূমিখণ্ডগুলি ছাড়া!
ওগুলিকে ঘিরে এক ধরনের অসহ্য অচেনা
প্রেম ও প্রতীক্ষা, ঘাম আর কাম আর অভিমান ছাড়া!

সভ্যতা

যা-কিছুই প্রাকৃতিক, তা-ই আসলে স্বাধীন প্রাণবন্ত
উদ্দাম অকুতোভয় অকৃত্রিম, অনেকটা অভদ্র, চণ্ড ও অতিকায়। কিন্তু
যখন তা ধীরে ধীরে মানুষের সভ্যতার আওতার ভিতর
আটকা পড়ে যায়, তখন সে হয়ে ওঠে অনেকটাই সুশীল, ভদ্র ও প্রসাধিত, কিন্তু
কেমন কৃত্রিম বদ্ধ ম্রিয়মাণ ভীরু নিরীহ এবং ক্ষুদ্র।

লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠা সেইসব দাবানল, সেইসব বন্য অগ্নি,
দিনে দিনে পোষ মেনে মেনে আজ হয়ে গেছে সব
মোমের, কূপির নম্র নিরীহ আগুন—নিজমনে জ্বলতে-থাকা।

আকাশের পর আকাশ চিরে ফেলা সেই মুহুর্মুহু বিজলি-লতাগুলি
তারাও এখন গৃহপালিত, ভদ্র ও প্রসাধিত।
তারা যে এখন সব ফ্লোরেসেন্ট, সাজানো-সাজানো,
এখন ঝাঁ-ঝকঝকে নীল-নীল ঝলমলে বিদ্যুৎসুন্দরী।

আর দুনিয়া দাপিয়ে ফেরা অতিকায় ডাইনোসরেরা—
কালচক্রে আজ তারা দেয়ালের নিরীহ টিকটিকি।

তাহলে এখন
এই ক্ষুদ্র ভদ্র ভোগায়তনের মধ্যে আটকা-পড়া এই যে আমি
এই যে বদ্ধ তটস্থ প্রাণছটফট কিন্তু সুশীলিত পালিশ-করা
মুখোশ-পরা জীবটি—এও কি তাহলে ছিল কোনোকালে
উদ্দাম স্বাধীন অকৃত্রিম আর অতিকায়?

প্রাচ্যতত্ত্ব

গড়িয়ে গড়িয়ে যায় সূর্য পূর্ব থেকে ক্রমে পশ্চিমের পথে
পূর্বটাকে একটু একটু করে অতীত ও পুরনো করে দিয়ে।

পূর্ব তবে কি পূর্বেই থেকে যায় আনুপূর্বিক?
প্রাচ্য কি কেবলই প্রাচীন? নাকি
প্রাচ্যেরও রয়েছে কোনো অধিক অতীত, যা বাচ্যেরও অতীত?

'পতিত ভূমির মতো অতীত ও নিষ্ফলা আজ প্রাচ্যের অতীত—
নিরুত্তাপ, ঘটনাবিহীনপ্রায়, ফাঁকা-ফাঁকা।
এইবার চলো ফিরি অতীতের দিকে
পশ্চিমবাহিনী এই খর সৌরস্রোতের দুর্দান্ত দাপটের বিপরীতে
ঘটনা ঘটিয়ে দিয়ে আসি চলো অতীতে—বর্ণাঢ্য,
ঝাঁঝালো, উত্তাপময় ঘটনার সমাহার।
এক ঝটকায় পূর্ণ করে দিয়ে আসি অতীতের যত শূন্যস্থান...
কিংবা
সূর্যের এই যে দিকনিশানা, পশ্চিমমুখী—কারা ঠিক করে দেয় প্রতিদিন?
পশ্চিম?—মানি না।
আজ থেকে উলট-চলনে চলবে সূর্য, চলবে ইতিহাস'—
বলতে বলতে গাট্টাগোট্টা ধরনের ক-জন খননবিদ অতীত খুঁড়তে
দুড়দাড় করে নামতে গিয়ে হড়কে পড়ে যায় অথই অতীতে,
খোঁড়লে।

লীলা

যেমন কাষ্ঠের সঙ্গে লোহার পিরিত, লোহা ভাসে জলে।
আবার যেমন দ্যাখো, প্রেমমন্ত্রে শিলা ভাসে নিছক তরলে।
এইরূপে দেশে দেশে কালে কালে
কত শিলা ভাসাবার লীলা চলে
নানা ছলে, নানান করণে।
দিকে দিকে উন্মেষ প্রেমের আর দেহবচনের, বহু পাঠে, পাঠ্যে, বহু প্রকরণে...

প্রাণী

মাছের যা আঁশ, তা-ই পাখির পালক,
প্রাণীর সেটাই কেশ ও কেশর, ঝিলিমিলি রোম ও পশম—
দেহান্তরে শুধু ভিন্ন-ভিন্ন নাম।

ওগুলি দিয়েই প্রাণী
কোনোমতে ঢেকে রাখে তার জরাদেহখানি।

শরীরে গ্রহণ লাগে, ধীরে ধীরে, সর্বনাশা জরার গ্রহণ—
খোলসে কুঞ্চন লাগে, কতশত রেখা জাগে, রেখায় রেখায় লেগে যায় গিঁট।
ক্ষরণ চলতেই থাকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সকল ঋতুতে।
প্রাণী, চির-অসহায়, কুতকুতে চোখ তুলে চায়
প্রাণী, হু-হু করে কেঁদে ওঠে একবার,
দেহকে প্রবোধ দেয়, বলে,
কী আর করবি বল্ জাদুসোনাচান,
অজর অক্ষর দেহখানি চেয়ে নিয়ে প্রভু
দিয়েছে এ জরাদেহখান।

প্রগতি

মহাসাগরের ধারে
উইটিবিটির মাথার ওপরে
নতুন ভূতের নির্ভুল বাতিঘর
আলো ছড়িয়েছে নব্যনতুন ভূতে।
তা-ই দেখে দেখে পথ চিনে চলে
বোরখায় ঢাকা কালো
বেদম কালচে একটি জাহাজ
আফিম-খাওয়ানো জন্তুর মতো চলে—
ধাবিত, কালো ও কেলেঙ্কারিত বেগে।

প্রগতি, পরিপ্রেক্ষিত : নতুন শতক

এক সদ্য-তৈরি নতুন শকট
এখনো জন্মোনি যার কোনো গতিবোধ—
বেগে রূপায়িত হবার মুহূর্ত আগে
টানটান হয়ে কাঁপছে থমকে-থাকা সমস্ত আবেগ,
রুদ্ধ বাষ্প, লিপ্সা, টুকরো টুকরো জায়মান ছায়াসমুদয়।

এইবার শকট ও সারথি, দুজনে মিলে
ঝাঁ-ঝাঁ করে গড়ে তুলবে যৌথ ভাবাবেগ
ডিজেলে ডোবানো নব্য মগজপুঞ্জের তুঙ্গ ভাব ও আবেগ।
ঝল্‌কে উঠছে নতুন ইন্দ্রিয়-পরম্পরা, স্নায়ুরজ্জু ছিঁড়ে-যায়-যায় টান,
এবং একের পর এক উসকে দেওয়া যত ঘুমন্ত রতিহর্ষ গতি।

এইভাবে, আসঙ্গে যুগলসঙ্গে তারা দ্রুত দীক্ষিত ধাবনধর্মে শুধু...

অতঃপর একটানা শুধুই ধাবন, রাশমুক্ত, অনর্গল—
কেবলই ধাবিত হওয়া
আর ভুলে যাওয়া
একধার থেকে, যত আছে অভিজ্ঞান, বেগসংযমের।

একজন বর্ণদাসী ও একজন বিপিনবিহারী সমাচার

বনের কিনারে বাস, এক ছিল রূপবর্ণদাসী
আর ছিল, বনে বনে একা ঘোরে, সেই এক বিপিনবিহারী।
কন্যা তো সে নয় যেন বন্য মোম, নিশাদল-মাখা, বন্য আলোর বিদ্রূপ
রাতে মধ্যসমুদ্রে আগুন-লাগা জাহাজের রূপ
অঙ্গে অঙ্গে জ্বলে—
দূর থেকে তা-ই দেখে কত রঙ্গে, কতরূপ ছলে ও কৌশলে
বেহুঁশ হয়ে যে যায়-যায়-প্রায় কত যে বামন গিরিধারী
আর যত অন্য-অন্য অর্বাচীন বিপিনবিহারী।

কন্যা তো সে নয়, বুনো সুর, বুনো তান, আর উপমান অরণ্যশোভার।
আঁচলে কূজন আঁকা তার, সেই বহুবল্লভার।

বনের কিনারে বাস, ছিল এক রূপবর্ণদাসী
আর ছিল বনে বনে একা ঘোরে সেই এক বিপিনবিহারী।
অসবর্ণ তারা, অসমান, অসবংশের জাতক
একসঙ্গে তবু দোঁহে একই বুনো বাদলে স্নাতক।
তবু সেতু গড়ে ওঠে সন্ধ্যাকালে দূর দুই তটে
সেতু, দেহকথনের গোধূলিভাষ্যে তা ফুটে ওঠে।

অভিব্যক্তি

শান্ত একটি ভূভাগ, সুশান্ত কিন্ত মরুময়,
যখন প্রচণ্ড রৌদ্রে পোড়ে
মর্মে তার শতযুগ সুপ্ত হয়ে থাকা এক উদ্দাম অরণ্যবোধ
রাগে দ্রোহে ক্রমে ব্যক্ত হয়ে ওঠে মোচড়ে মোচড়ে।
একটানা রাগী রৌদ্রবিবৃতির ঝাঁঝালো ঝাপটার মধ্যে জেগে-ওঠা
ওই সেই ব্যক্তি, বন্য অভিব্যক্তি, আজ
অন্য এক ব্যক্তিগত বিস্মরণদেশ থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে
উড়িয়ে উড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি প্রবল হাওয়ায়—
মরু এলাকায় খুব আকস্মিক ঝেঁপে আসা
বিরল বৃষ্টির মতো।

সখাসংগীত

উদ্‌গান।
এই উদ্‌গান সখার উদ্দেশে।

অদেখা অচেনা এক সখার জন্যে আকাঙ্ক্ষা—
যে রঙিন। যে বহুদূর।
দূর কোনো অজানায় যার অবস্থান।
এবং যার কাছ থেকে, থেকে থেকে, অনিয়মিতভাবে, ভেসে আসে
কখনো সন্দেশ, কখনো সন্ধ্যাবাতাস,
কখনো উস্‌কানি, কখনো সমর্থন,
কখনো আনুগত্য, কখনো-বা অভিভাবকত্ব, মৃদু;
কখনো-বা রৌদ্রঢালা দিগন্তবিস্তৃত ঔপনিবেশিকতা।

আর কিছু বাক্য কিছু গান
কিছু রূপ কিছু প্রাণ—
এইসব আর যা যা ভেসে আসে...
সুরশলাকার মসৃণ কাঁপনের মতো করে কেঁপে কেঁপে
বাতাসে মিহি তরঙ্গ তুলে ভেসে আসে...

আমার সখারা দূরের, অনেক দূরের শহরে থাকে।
শুধু
একটি সখার নদীর কিনারে বাস
বিদেশী নদীর রাংতা-মোড়ানো বাঁকে
আমার বন্ধু নদীর কিনারে থাকে।

দূরে তার দেশ কাঁপা-কাঁপা রূপকাহিনির মতো কাঁপে
সখাটি আমার নদীর কিনারে থাকে।

এবেলা আমার গৃহ নাই কোনো সখা,
কী যে ঘোর গৃহতৃষ্ণা জাগছে তাই।
মনে করি, যাব তোমাদের দেশে চলে
নাকি
তুমিই আমাকে অধীনে তোমার ধীরে ধীরে টেনে নেবে?

তোমার অধীনে, অধিগ্রহণে আর শাসনের নীচে
একদিন জানি আমাকেও তুমি ধীরে ধীরে টেনে নেবে।
আমাকে তোমার পালনের, অভিভাবনের ছায়া দিয়ে
পুরোপুরি দেবে ঢেকে।
আহা
এমন সোনালি বন্ধুর খোঁজ পেলাম যে কোত্থেকে!

তোমাদের দেশে সন্দেশক্ষেত থেকে
হাওয়া এসে লাগে থেকে থেকে এই দেহে।
অচেনা পুলক শিহর তুলছে পালকে।
সন্ধ্যার কালে বার্তা পাঠালে রূপকে ও সংকেতে;
কিছু তার পাই ডাকে
আর কিছু আসে হঠাৎ দমকা তথ্যপবনে ভেসে।
তথ্যপবনে বন্ধু আমার সন্দেশ পাঠিয়েছে।

বোধ করি এই হাওয়াটা প্ররোচনার।
হঠাৎ খেয়ালে বদ্‌লে ফেলে দিঁ এসো
পরস্পরের আগুন আর অঙ্গার—
প্রেরিত বার্তা উস্‌কিয়ে যায় এইসব অভিলাষ।
আমার সখার নদীর কিনারে বাস।

অদেখা অজানা বন্ধু আমাকে
জড়িয়ে ফেলছে অচেনা স্মারকে...

এবেলা আমার কেউ নেই পৃথিবীতে
কী যে আত্মীয়-পিপাসা জাগছে প্রাণে!
টানায়, পড়েনে, লীলায়, অবলীলায়
অমান্য করি প্রকাশ্যে ভেদরেখা
তোমাকেই তবে করে ফেলি আত্মীয়
আজিকে আমার বন্ধুর গায়ে রঙিন উত্তরীয়।

তোমার অধীনে, অধিগ্রহণে, আর শাসনের নীচে
একদিন জানি আমাকেও ঠিক ধীরে ধীরে টেনে নেবে।
আমাকে তোমার পালনের, অভিভাবনের ছায়া দিয়ে
পুরাপুরি দেবে ঢেকে।
তার আগে সখা নিজে
খুব অনুগত আর দ্রবীভূত থাকুক একটি দিন
আমার এই রচনায়
এই প্রশাসনে, প্রহারে এবং আজ্ঞা-অনুজ্ঞায়।
শুধু
একটি দিবসে সুশীল বালক থেকো,
পরদিন থেকে ধীরে ধীরে তুমি অবাধ্য হয়ে যেয়ো।
কিংবা না হয় হয়ে থেকো তারও পরে
জটিল আর দুর্বোধ্য অনেক দিন।

শুধু একদিন
আমার বন্ধু আমারই প্রভাবে আমার এই রচনায়
ছায়াসহ উড্ডীন।

ভিন্ন ভুবনে ভিন্ন নদীর বাঁকে
সখাটি আমার নদীর কিনারে থাকে।
দূরে তার দেশ কাঁপা-কাঁপা রূপকাহিনির মতো কাঁপে
আমার বন্ধু নদীর কিনারে থাকে।

উৎসভূমিতে ভূমিধস নামে, আর
একে একে সব অবলম্বন হচ্ছে প্রত্যাহার।
বাকল লুপ্ত, ভাঙা-ভাঙা ডাল, মরিচা-প্রাচীন দেহ,
পাখিপল্লবহারা—
তবুও যে এই দারুণ দূষণদিনে
দাঁড়িয়ে রয়েছি ধুধুতর নির্জনে—
শুধু তোমারই সমর্থনে।
তোমার পাঠানো এই ধরনের বিরল সমর্থনে।
এ রচনাটিও পুনর্বাসিত তোমারই উদ্ভাসনে।

আমার বন্ধু নদীনির্দেশ করে।
থমকে-যাওয়া অনেক প্রকার নদীকে সচল করে।

তোমার আমার সরল সূত্র, সহজ বাক্যগুলি
চাপা পড়ে আছে নিস্তারহীন তথ্যজটের নিচে।
ফুরিয়ে যাবেই একদিন ঠিক আবর্জনার দিন—
তেড়েফুঁড়ে যত জট আর জঞ্জাল
আমাদের কথা আলো দিয়ে যাবে জোনাকি-পরিভাষায়।

ঠিক একই দিনে একই ক্ষণে
তুমি আমি মিলে উধাও উড়ালে
চলে যাব এই দেহ ছেড়ে, এই যৌথরচনা ফেলে।
আশেপাশে কত জরুরি ভাণ্ড, মহান কীর্তি,
গুরুত্ববহ স্থাপনাসমূহ আর,
কথিত সিভিল দুনিয়ার।

ভাণ্ড ভেঙে ফেলে, স্থাপনা উল্টিয়ে, যত
কীর্তি একাকার কীর্তি গড়াগড়ি যাবে...
মারণে উচাটনে কালের সন্ত্রাসে, যত
বিরামচিহ্নের প্রভাবে প্রটোকলে প'ড়ে
উহ্য হয়ে যাব আমরা একদিন ধীরে
সন্ধ্যানদীতীরে সন্ধ্যাভাষাকূলে
রঙিন মেঘেদের সন্ধ্যাচ্যানেলের ভিড়ে।

তুমি আমি মিলে, প্রস্থান থেকে প্রস্থানে যাওয়া-কালে
পাল্টিয়ে যাব এক এক করে
রং-রূপ-ভাষা, ঘটনার—
দৃশ্যের থেকে দৃশ্যের।
রেডিও ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় চেপে,
হোক হঠকার, তবু একদিন ডানা
ভাসাব বহির্বিশ্বে।

ঠিক একই দিনে একই ক্ষণে
তুমি আমি মিলে উধাও উড়ালে
চলে যাব এই দেহ ছেড়ে, এই যৌথরচনা ফেলে।

অদেখা অচেনা বন্ধু আমাকে
জড়িয়ে ফেলছে রঙিন স্মারকে...

তুমি আমি মিলে, প্রস্থানকালে, চলো
যথাযথভাবে নদীনির্দেশ করে যাই
থমকে রয়েছে অনেক প্রকার নদী।
বড় বড় সব উত্থানগুলি আজ
স্তব্ধ নদীর কিনারে অবস্থিত।
স্তব্ধ নদীকে করে দিয়ে যাই চলো
একটি তুড়িতে সচল, কল্লোলিত।

ভিন্ন ভুবনে ভিন্ন নদীর বাঁকে
সখাটি আমার নদীর কিনারে থাকে।
দূরে তার দেশ কাঁপা-কাঁপা রূপকাহিনির মতো কাঁপে
আমার বন্ধু নদীর কিনারে থাকে।

যুগ যুগ ধরে আড়ালে আড়ালে
নদীর সূত্রে, মেঘের চ্যানেলে
বিছিয়ে চলেছি আমাদের যোগাযোগ।
এই কবিতাটিসহ
সখাকে, আমাকে, নদীর আলোকে বিবেচনা করা হোক।